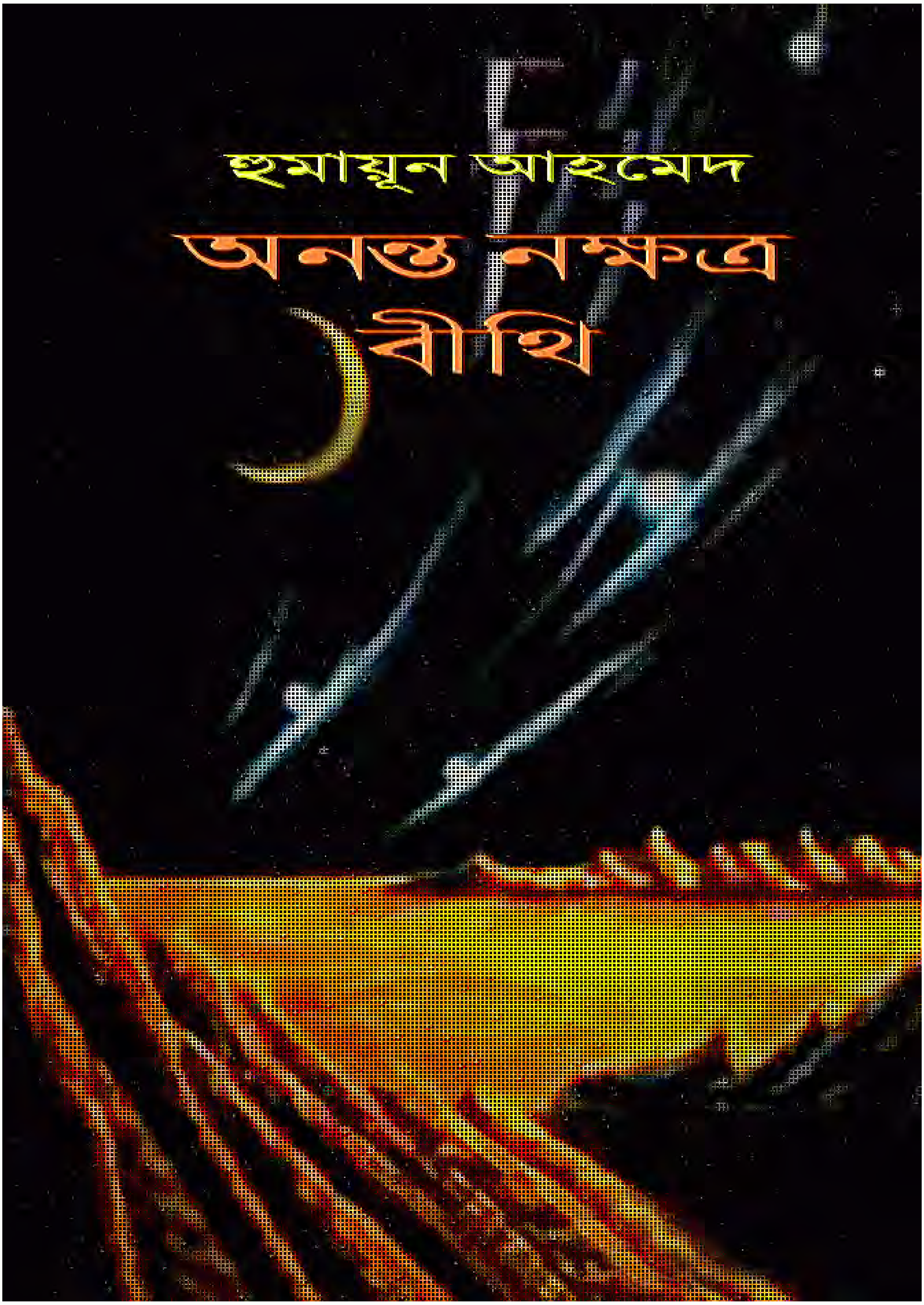

হুমায়ূন আহমেদ

অনন্ত নক্ষত্র বীথি

অনন্ত নক্ষত্রবীথি

অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ হচ্ছে।

পরিচিত কোনো শব্দের সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র মিল নেই বলে শব্দটাকে ঠিক ব্যাখ্যা করা যাবে না। লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝি পোকার আওয়াজকে যদি কোনো উপায়ে কমিয়ে অতি সূক্ষ্ম পর্দায় নিয়ে আসা যায় এবং সেই আওয়াজটাকে দিয়ে ঘূর্ণির মতো কিছু করা যায়, তাহলে বোধ হয় কিছুটা ব্যাখ্যা হয়। না, তাও হয় না। আওয়াজটার মধ্যে ধাতব ঝংকার আছে। ঝিঁঝি পোকার আওয়াজে কোনো ধাতব ঝংকার নেই। শব্দটা অস্বস্তিকর। স্নায়ুর ওপর চাপ ফেলে। আমাকে বলা হয়েছে এই শব্দ সহ্য হয়ে যাবে। মানুষের সহ্য করবার শক্তি অসীম। কাজেই সহ্য হলেও হতে পারে। কিন্তু আমার এখনো হচ্ছে না। কোনোদিন হবে বলেও মনে হয় না। আমি খুবই অস্থির বোধ করছি।

মহাশূন্যযান—'গ্যালাক্সি টু'-তে আজ আমার তৃতীয় দিন। এর আগে আমি কখনো কোনো মহাশূন্যযানে ওঠা দূরে থাক, তার ভেতরের ছবি পর্যন্ত দেখি নি। মহাশূন্যের প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই। অযুত নিযুত লক্ষ কোটি মাইল দূরের গ্রহগুলি কেমন ? সেখানে প্রাণের বিকাশ ঘটেছে কিনা তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

আমি একজন টিভি প্রোগ্রাম মনিটার কার্যক্রমের অতি সামান্য কর্মচারী। আমার কাজ হচ্ছে বিশেষ বিশেষ কোনো টিভি প্রোগ্রাম দর্শকদের কেমন লাগল তা মনিটর করে স্ট্যাটিসটিক্স তৈরি করা। যেমন টিভি চ্যানেল থ্রিতে একটা হাসির সিরিয়েল হচ্ছে, নাম—'কথা বলা না-বলা।' আমার কাজ হচ্ছে প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন বাড়িতে টেলিফোন করে অত্যন্ত ভদ্রভাবে জানতে চাওয়া, 'ম্যাডাম (বা স্যার), আপনি কি এই মুহূর্তে টিভি দেখছেন ?'

যদি উত্তর হয় 'হ্যাঁ', তাহলে বলা, 'কোন চ্যানেল দেখছেন ?'

তার উত্তর হ্যাঁ হলে জিজ্ঞেস করা, 'কথা বলা না-বলা' অনুষ্ঠানটি আপনার কেমন লাগছে ?' বেশির ভাগ সময়ই কোনো উত্তর পাওয়া যায় না, আমার প্রশ্ন শুনেই খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখে। কেউ কেউ অত্যন্ত রাগী গলায় বলে, 'আমাদের-এ-ভাবে বিরক্ত করার কী অধিকার আছে আপনার ?' আবার অনেকে কুৎসিত গালাগালি করে। আমি গায়ে মাখি না। গায়ে মাখলে চাকরি করা যায় না। আমি হাসিমুখে আমার কাজ করি। যথাসময়ে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিই। আমার মতো আরো অনেকেই আছে। তারাও রিপোর্ট পাঠায়। এইসব রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে প্রোগ্রাম রেটিং করা হয়। মাস শেষ হলে একটা চেক পাই।

গত মাসে ব্যতিক্রম হল। চেকের সঙ্গে আলাদা খামে এক চিঠি এসে উপস্থিত। চিঠির ওপর সোনালি রঙের ত্রিভুজের ছাপ। এর মানে হচ্ছে, 'অত্যন্ত জরুরি। এক্ষুণি খাম খুলে চিঠি পড়ে ব্যবস্থা নিতে হবে।' আমি অবশ্যি তা করলাম না। প্রথম চেকটি দেখলাম, টাকার অঙ্ক ঠিক আছে কিনা। একটি বোনাস পাওনা

হয়েছিল। সেই বোনাস দেয়া হয়েছে কিনা। দেয়া হয়েছে। সব ঠিকঠাক আছে। তারপর আমি ত্রিভুজ চিহ্নের খাম খুলনাম। এ কী অসম্ভব ব্যাপার ! মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টর আমাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন।

জনাব,

আপনাকে অবিলম্বে মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের সপ্তম শাখায় উপস্থিত হতে বলা হচ্ছে। অত্যন্ত জরুরি।

বিনীত
এস. মাথুর
ডিরেক্টর, মহাশূন্য গবেষণা কেন্দ্র-৭

নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ভুল হয়েছে। প্যাঁচ লেগে গেছে। আমার মতো নগণ্য ব্যক্তিকে মহাশূন্য গবেষণা কেন্দ্র কেন শুধু শুধু ডাকবে ? তবে ভুল হোক আর যাই হোক উপস্থিত আমাকে হতেই হবে। কারণ চিঠির উপর সোনালি রঙের ত্রিভুজ আঁকা। একে অগ্রাহ্য করা প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় অপরাধ। আমি ছুটলাম ট্র্যাভেল এজেন্টের কাছে—বিমানের বুকিং-এর ব্যাপার আছে। কিভাবে গবেষণা কেন্দ্র-৭-এ যেতে হয় তাও জানি না।

ট্রাভেল এজেন্টের সুন্দরী তরুণী যেন আমাকে অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ দিচ্ছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আগামী দু' মাসের ভেতর কোনো বুকিং দেয়া যাবে না।' আমি ত্রিভুজ আঁকা চিঠি তার হাতে দিতেই সে গম্ভীর মুখে বলল, 'মিনিট দশেক অপেক্ষা করুন। দেখি কি করা যায়।'

দশ মিনিটও অপেক্ষা করতে হল না। সাত মিনিটের মাথায় সে বলল, 'আপনাকে একটি জরুরি বুকিং দেয়া হয়েছে। আজ রাত ন'টা কুড়ি মিনিটে আপনার ফ্লাইট। ন'টার সময় চলে আসবেন। কাগজপত্র রেডি করে রাখব। আপনার ভ্রমণ শুভ হোক, সুন্দর হোক।'

আমি মুখ শুকনো করে এ্যাপার্টমেন্টে চলে এলাম। রাত ন'টা বাজতে এখনো পাঁচ ঘণ্টা দেরি। এই পাঁচ ঘণ্টা কাজে লাগানো যায়। আমার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। এ কী সমস্যায় পড়লাম। একদল লোক আছে, দেশ-বিদেশ ঘুরতে যাদের ভালো লাগে আমি সে-রকম না। কাজ শেষ করে নিজের এ্যাপার্টমেন্টে ফিরে টিভি সেট খুলে বসাতেই আমার আনন্দ। রান্নাবান্না করাতেও আমার কিছু শখ আছে। আমার লাইব্রেরিতে বেশ কিছু রান্নার বই আছে। বইপত্র দেখে সপ্তাহে একদিন একটা নতুন রান্না করি। সেদিন নিকিকে আসতে বলি। সব দিন সে আসতে পারে না। সে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কাজ করে। অবসর তার খুবই কম। সেই অবসরগুলির বেশির ভাগই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ম্যানেজার দখল করে রাখে। এখানে ওখানে নিকিকে নিয়ে যায়। সুযোগ পেলেই গায়ে হাত দিতে চায়। নিকি

সব সহ্য করে। কারণ ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের চাকরিটা সে ছাড়তে চায় না। বোনাস-টোনাস মিলিয়ে এই চাকরিটা ভালোই। ওভারটাইম আছে। ওভারটাইমের পয়সাও ভালো। নিকি টাকা জমাচ্ছে। আমি নিজেও জমাচ্ছি। আমরা বিয়ে করতে চাই। বিয়ের জন্যে যে বিশাল অঙ্কের লাইসেন্স ফি দরকার, তা আমাদের নেই। কষ্ট করে টাকা জমানোর এই হচ্ছে রহস্য।

আমরা ঠিক করে রেখেছি বিয়ের পর দু' কামরার একটা এ্যাপার্টমেন্ট নেব। দু'জনে খুব কষ্ট করে হলেও টাকা জমাব। সেই টাকায় প্রতি বছর ভ্রমণ-পাস কিনব। নিকি নতুন নতুন জায়গায় যেতে খুব ভালোবাসে। আমার এত শখ নেই, তবু নিকির আনন্দেই আমার আনন্দ।

টেলিফোন করতেই নিকিকে পাওয়া গেল। তার গলার স্বরে ক্লান্তি ঝরে পড়ছে। যেন হ্যাঁ-না বলতেও তার কষ্ট হচ্ছে। আমি বললাম, 'নিকি তুমি কী করছ?'

'কিছু করছি না। বসে বসে হাই তুলছি। এত ক্লান্ত যে মনে হচ্ছে এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়ব।'

'তুমি কি একটু আসতে পারবে?'

'কেন?'

'আমি একটা ঝামেলায় পড়েছি।'

নিকির গলার স্বর থেকে ক্লান্তি মুছে গেল। সে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'কী হয়েছে?'

'আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'এক্ষুণি আসছি।'

এই হচ্ছে নিকি। তার যত কাজই থাকুক, যত ঝামেলাই থাকুক, আমার কোনো সমস্যা হয়েছে শুনলে ছুটে আসবে। বাস বা ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করবে না। সাবওয়েতে লাইনে দাঁড়াবে না। ট্যাক্সি ভাড়া করবে, যাতে সবচেয়ে কম সময়ে উপস্থিত হওয়া যায়।

নিকি ঠিক রূপবতী নয়। তার ঠোঁট মোটা, চোখ ছোট ছোট। হাতের থাবা পুরুষদের মতো বিশাল। তবু তার দিকে তাকালেই আমার মন অন্য রকম হয়ে যায়। তাকে মনে হয় এই পৃথিবীর সবচেয়ে রূপবতী মেয়ে। যার পাশে বসে একটি জীবন অনায়াসে পার করে দেয়া যায়।

নিকি আধ ঘন্টার মধ্যে উপস্থিত হল। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ইউনিফর্ম পর্যন্ত ছাড়ে নি। চলে এসেছে।

'কী হয়েছে?'

'বস। স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস নিতে শুরু কর, তারপর বলছি।'

'এক্ষুণি বল।'

আমি ত্রিভুজ আঁকা চিঠিটি দিলাম। নিকি নিজেও কিছু বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে বলল, 'তোমাকে এই চিঠি দিচ্ছে কেন?'

'আমি জানি না। বড় ভয় লাগছে।'

'ভয়ের কী আছে ? তুমি তো কোনো অন্যায় কর নি। হয়তো তারা তোমাকে কোনো কাজ দিতে চায়।'

'আমাকে কাজ দেবে কেন ? ওদের কাজের আমি জানি কী ?'

আমি লক্ষ করলাম নিকি নিজেও ভয় পাচ্ছে। ভয় পেলে নিকির খুব নাক ঘামে। এবং সে রুমাল দিয়ে একটু পরপর নাক ঘষতে থাকে। এখনো সে তাই করছে। আমি নরম গলায় বললাম, 'চল যাই, বাইরে কোথাও খেয়ে নেব। আমার হাতে সময় বেশি নেই।'

নিকি হ্যাঁ-না কিছু বলল না। আমি বললাম, 'শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছি, আমার মনে হয় কোথাও একটা ভুল হয়েছে। সপ্তম কেন্দ্রে পৌছানমাত্র ভুল ধরা পড়বে।'

আমরা দামি একটা রেস্তোরাঁয় খাবার খেলাম। অনেকগুলি টাকা বেরিয়ে গেল। এত দামি দামি খাবার, অথচ কোনোটাই ভালো লাগছে না। নিকি মন খারাপ করে খাবারদাবার নাড়াচাড়া করছে। আমি আবার বললাম, 'কোথাও একটা ভুল হয়েছে। তুমি দুশ্চিন্তা করবে না। সপ্তম কেন্দ্রে পৌছেই তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব।'

নিকি এই কথারও জবাব দিল না।

সপ্তম কেন্দ্রে পৌছে আমি নিকির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম না। আমাকে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হল এস. মাথুরের কামরায়।

কামরাটি বিশাল। দিনের বেলাতেও বড় একটা ডিমলাইট জ্বলছে। দরজা জানালা বন্ধ। ঘরটা অন্য সব ঘরের চেয়ে ঠাণ্ডা। আমার শীত শীত করতে লাগল। এস. মাথুর মানুষটি বৃদ্ধ। মাথায় কোনো চুল নেই। শুধু মাথা নয়, ভুরুতেও চুল নেই। গোলাকার মুখ—কুৎসিত দেখাচ্ছে। কিন্তু গলার স্বর আশ্চর্য রকম সতেজ। তিনি আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'আপনি বসুন।'

আমি বসলাম। ক্ষীণ স্বরে বললাম, 'আমাকে কেন ডাকা হয়েছে বুঝতে পারছি না।'

এস. মাথুর কিশোরদের মত সতেজ গলায় বললেন, 'মহাশূন্য গবেষণা-প্রকল্প থেকে প্রতি ছ' বছর পরপর একটি বিশেষ ধরনের মহাকাশযান পাঠানো হয়, তা কি আপনি জানেন ?'

'জ্বি না।'

'সাধারণ মহাকাশযানের গতিপথ সৌরমণ্ডলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই বিশেষ মহাকাশযানগুলি হাইপারডাইভ ক্ষমতাসম্পন্ন। হাইপারডাইভ কী, আপনি জানেন ?'

'জ্বি না।'

'সময় সংকোচক ডাইভ। আরো সহজ করে বলি। ধরুন আপনি একটি মহাকাশযানে করে যাচ্ছেন। মহাকাশযানটির গতিবেগ আলোর গতিবেগের

কাছাকাছি। এই ক্ষেত্রে ১০ আলোকবর্ষ দূরের কোনো জায়গায় যেতে আপনার সময় লাগবে দশ বছর। কিন্তু এই দূরত্ব হাইপার স্পেস ডাইভের কল্যাণে আপনি এক মাইক্রো সেকেন্ডে অতিক্রম করতে পারবেন। হাইপার স্পেস ডাইভের কল্যাণে আমরা আজ অকল্পনীয় দূরত্বে পৌঁছতে পারছি।'

'আপনি আমাকে এসব কেন বলছেন বুঝতে পারছি না।'

'হাইপার স্পেস ডাইভ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি মহাকাশযান খুব শিগগিরই রওনা হচ্ছে। ঐ মহাকাশযানে সাতজন ক্রু আছে। এরা সবাই একেকটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। এ ছাড়াও আছে চারটি পি এস ফোর রোবট। পি এস রোবট হচ্ছে রোবটটিকস-এর বিস্ময়। টেনার জাংশানে মুক্ত কপেট্রনের রোবট।'

'আমি এখনো বুঝতে পারছি না, আপনি আমাকে এসব কেন বলছেন।'

'আপনাকে এত কিছু বলছি, কারণ ঐ মহাকাশযানের আপনিও একজন যাত্রী।'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'বড় ধরনের এক্সপিডিশনগুলিতে আমরা নিয়মিত ক্রুদের সঙ্গে অনিয়মিত একজনকে ঢুকিয়ে দিই। খুবই সাধারণ একজন। যার কোনো রকম টেকনিক্যাল জ্ঞান নেই। সে চলে তার সহজাত বুদ্ধিতে। কোনো বড় ধরনের সমস্যা সে তার নিজের মতো করে সমাধান করতে চায়। আমরা দেখেছি শতকরা সাতানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে এই জাতীয় সহজ সমাধানই একমাত্র সমাধান। বিশেষজ্ঞরা বা অতি উন্নত রোবটরা সহজ সমাধান চট করে ধরতে পারে না।'

'কোনো রকম সমস্যা সমাধান করবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি খুবই নগণ্য ব্যক্তি।'

'অনেক রকম বাছাইয়ের পর আপনাকে আলাদা করা হয়েছে। এক সপ্তাহের মতো সময় আপনার হাতে আছে। এই সময়ে আপনাকে নিয়ে কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করা হবে। হাইপার স্পেস ডাইভ দেয়ার মতো শারীরিক যোগ্যতা আপনার আছে কি না দেখা হবে। তারপর যাত্রা শুরু।'

'ফিরে আসব কবে ?'

'কখন ফিরবেন এই ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। একটি হাইপার স্পেস ডাইভের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বয়স প্রায় একশ' বছর বেড়ে যায়। ধরুন, তিনটি হাইপার স্পেস ডাইভ দিয়ে আপনি পৃথিবীতে ফিরলেন। ফিরে এসে দেখবেন পৃথিবীর বয়স তিনশ' বছর বেড়ে গেছে। হয়তো পৃথিবী কোনো প্রাকৃতিক কারণে ধ্বংসই হয়ে গেছে। কাজেই ফিরে আসার সময় জানতে চাওয়া অর্থহীন।'

আমি অবাক হয়ে এই লোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কী বলছে সে ! এর মানে কী !

'কত বড় সৌভাগ্য আপনার ভেবে দেখুন। আপনি হবেন মানবজাতির প্রথম প্রতিনিধি দলের একজন, যে অন্য একটি গ্যালাক্সিতে পা রাখবে।'

'কী হবে পা রেখে ?'

'অনেক কিছুই হতে পারে। হয়তো অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো প্রাণীর সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ হবে। তাদের কল্যাণে আমরা সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যগুলি জেনে ফেলতে পারব। সময় ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছি না। তারা হয়তো আমাদের সময় ব্যাপারটা কী, বুঝিয়ে দেবে। আমরা তখন ইচ্ছামতো সময়কে সংকুচিত ও প্রসারিত করতে পারব।'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন আমি আর কোনোদিন এই চেনা পৃথিবীতে ফিরে আসব না ?'

'হ্যাঁ তাই।'

আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাকে এই ঘর থেকে বের করে আলাদা করে ফেলা হল। আমি কত জনকে যে বললাম, 'আমাকে একটা টেলিফোন করতে দিন। একজনের সঙ্গে একটু কথা বলব। ঘড়ি ধরে এক মিনিট। এর বেশি নয়।'

কেউ আমার কথার কোনো উত্তর দিল না। একজন শুধু বলল, 'সপ্তম কেন্দ্রের গবেষণাগার থেকে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা নেই।'

নিকির সঙ্গে আমার কথা বলা হল না।

সময়ের কোনো হিসাব আমার কাছে ছিল না। গবেষণা কেন্দ্রের যেখানে আমাকে রাখা হল, দিন এবং রাত বলে সেখানে কিছু নেই। সারাক্ষণই কৃত্রিম আলো জ্বলছে। আমাকে বলা হল মানুষের শরীরে দিন-রাত্রির যে-চক্র তৈরি হয় তা ভেঙে দেবার জন্যই এই ব্যবস্থা। তাদের কোনো কথাই আমি মন দিয়ে শুনি না। যা করতে বলে করি, এই পর্যন্তই।

একবার তারা আমাকে একটা সিলিন্ডারের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এ জাতীয় অন্ধকার পৃথিবীতে কখনো পাওয়া যায় না। অন্ধকার যে এত ভয়াবহ হতে পারে তা আমার কল্পনাতেও ছিল না। কত সময় যে কেটে গেল সেই সিলিন্ডারে। কী ভয়াবহ অবস্থা ! প্রচণ্ড খিদে, তবু মনে হয়েছে খাদ্য নয়, আমার প্রয়োজন আলো। সামান্য আলো। প্রদীপের একটি ক্ষুদ্র শিখার জন্যে আমি আমার নশ্বর জীবন দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আলো ভাগ্যে জোটে নি। খাদ্য এসেছে, আলো নয়। আশ্চর্য, এক সময় সেই অন্ধকারও সহ্য হয়ে গেল। মনে হল আলোহীন এই জগৎই-বা মন্দ কি। যখন পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে গেলাম তখন আমাকে চোখ-ধাঁধানো আলোয় ঝলমল করছে এমন একটি ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া হল। আহ্ কী তীব্র আলো ! প্রাণপণে চেঁচিয়েছি, 'আলো চাই না, অন্ধকার চাই। কুৎসিত এই আলোর হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর।'

কত বিচিত্র ধরনের ট্রেনিং। ভরশূন্যতার ট্রেনিং, শব্দহীন জগতের ট্রেনিং, আবার ভয়াবহ শব্দের ট্রেনিং।

তারপর একদিন ট্রেনিং পর্ব শেষ হল। আমাকে গোলাকার একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। আমার সঙ্গে গবেষণাগারের একজন কর্মী। ঘরটির মাঝখানে ছোট্ট টেবিলে একটা টেলিফোনের সেট।

গবেষণাগারের কর্মী আমাকে বললেন, 'এখন আপনি আপনার বান্ধবীকে একটা টেলিফোন করতে পারেন। নাম্বার মনে আছে তো, নাকি ট্রেনিং-এর ঝামেলায় সব ভুলে বসে আছেন ?'

'নাম্বার মনে আছে।'

নিকিকে তার বাসার নাম্বারেই পাওয়া গেল। সে অসম্ভব অবাক হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার তোমার ?'

আমি বহু কষ্টে বললাম, 'তোমার কী খবর ? তুমি কেমন আছ ?' নিকি রাগী স্বরে বলল, 'আমার খবর তোমার কী দরকার ? তুমি তোমার খবর বল। হচ্ছেটা কী ?'

আমাকে একটা মহাকাশযানে করে পাঠানো হচ্ছে।'

'কী বলছ তুমি এসব !'

'সত্যি কথাই বলছি নিকি।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আমিও বুঝতে পারছি না।'

প্রায় দশ মিনিটের মতো কথা বললাম। নিকি ব্যাকুল হয়ে কাঁদল। আমার চোখও বারবার ভিজে উঠল। এক সময় টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। আমার সঙ্গী আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তার চোখে চোখ রেখে একটু হেসে বললাম, 'এতক্ষণ যার সঙ্গে কথা বললাম, সে নিকি নয়। সে আপনাদের একজন।'

আমার সঙ্গী বিস্মিত হয়ে বলল, 'একথা কেন বলছেন ? তার গলার স্বর কি আপনার কাছে অন্য রকম মনে হয়েছে ?'

'না, গলার স্বর নিকির মতো। আচার-আচরণ, কথা বলার ঢং সবই নিকির মতো। তবু আমি জানি, সে নিকি নয়।'

'কখন জানলেন ?'

'টেলিফোন নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে জানলাম।'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন। এতক্ষণ আপনি কথা বলেছেন একটি ভয়েস সিনথেসাইজারের সঙ্গে।'

'আমার সঙ্গে এই রসিকতা করার প্রয়োজনটা তো ধরতে পারছি না। শুরুতে আমি নিকির সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি। পরে কিন্তু আর চাই নি।'

'আমরা ছোট্ট একটা পরীক্ষা চালানোর জন্যে টেলিফোনের ব্যবস্থাটা করেছি।'

'কী পরীক্ষা ?'

'মহাকাশযানে করে পাঠানোর জন্যে সব সময় স্বাভাবিক ক্রুদের বাইরে একজনকে নেয়া হয়। সেই একজন কিন্তু রাম শ্যাম যদু মধু কেউ নয়। সেই

একজন হচ্ছে বিশেষ একজন। যার কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে। ইএসপি জাতীয় ক্ষমতা। আপনার তা প্রচুর পরিমাণে আছে।'

'কী করে বুঝলেন ?'

'সেন্ট্রাল কম্পিউটার পৃথিবীর সব মানুষদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখে। আপনার সম্পর্কে খবর সেখান থেকেই পাওয়া।'

'খবরটা ভুল। আমার ইএসপি কেন, কোনো ক্ষমতাই নেই। থাকলে আমি তা জানতাম। আমি জানব না, অথচ সেন্ট্রাল কম্পিউটার জানবে—তা কী করে হয় ?'

'জন্মসূত্রে আপনি যে-ক্ষমতা নিয়ে এসেছেন তার কথা তো আপনার জানার কথা নয়। তা জানবে অন্য জন। আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই, আপনি টিভি প্রোগ্রাম মনিটার করতেন।'

'হ্যাঁ, ওটাই আমার চাকরি।'

'চ্যালেন থ্রির একটা প্রোগ্রাম আপনি মনিটার করছিলেন, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'যে সময় ঐ প্রোগ্রামটি চলত তখন মাত্র নয় দশমিক এক ভাগ লোক ঐ প্রোগাম দেখত। চল্লিশ দশমিক দুই ভাগ লোক কোনো প্রোগ্রামই দেখত না। বাকিরা দেখত অন্য চ্যানেলের প্রোগ্রাম, ঠিক না ?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'অথচ আপনি যাদের বাসায় টেলিফোন করতেন তারা সবাই ঐ প্রোগ্রামটি দেখত। আপনি জেনেশুনে টেলিফোন করতেন না। এমনিতেই করতেন। কিন্তু দেখা যেত এ বাসায় কেউ না কেউ চ্যানেল থ্রির প্রোগ্রামটি দেখছে। খুব উঁচু ধরনের ইএসপি ক্ষমতা না থাকলে তা সম্ভব নয়। তাছাড়া...।'

'তাছাড়া কী ?'

'আপনাকে নিয়ে পাঁচটি জেনার টেস্ট করা হয়েছে। প্রতিটি টেস্টে আপনি এক শ' নম্বর স্কোর করেছেন, যা অকল্পনীয় একটা ব্যাপার।'

'আমার ইএসপি ক্ষমতা কী কাজে লাগবে ?'

'হয়তো কোনোই কাজে লাগবে না, তবে মহাকাশ-যাত্রা, বিশেষ করে নিজেদের গ্যালাক্সি ছেড়ে অন্য একটি গ্যালাক্সিতে পা দেয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপারে আপনার মতো ইএসপি ক্ষমতাধর কাউকে দরকার।'

আমার ইচ্ছা করছিল আচমকা লোকটির গালে একটা চড় বসিয়ে দিই। বহু কষ্টে সেই ইচ্ছা দমন করলাম। কী লাভ ? কী হবে হৈচৈ করে ? কিছুই হবে না। যথাসময়ে আমাকে যাত্রা করতে হবে। যেতে হবে সবকিছু পেছনে ফেলে। এই পৃথিবীকে আমার কখনো অসাধারণ কিছু বলে মনে হয় নি, তবু পৃথিবীর জন্যে মায়া লাগছে।

২

আমাদের এই মিশনটির একটি নাম আছে—বরগ মিশন। মহাকাশযানের অধিনায়ক জন বরগের নাম অনুসারে মিশনের নাম।

আমি ভেবেছিলাম জন বরগ লোকটি অসাধারণ কেউ হবেন। হয়তো তিনি অসাধারণ। কিন্তু আমার কাছে প্রথম দর্শনে তাঁকে খুব অসাধারণ মনে হল না। রোগা লম্বা একজন মানুষ। বেশিক্ষণ চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেন না কিংবা কথা বলেন না। চোখ নামিয়ে নেন। মেয়েদের মতো পাতলা ঠোঁট। ঠোঁট টিপে হাসার অভ্যাস আছে। খুব জরুরি ধরনের কথাবার্তার মাঝখানে হঠাৎ তাঁর দিকে তাকালে দেখা যাবে তিনি মাথা নিচু করে ঠোঁট টিপে হাসছেন। যেন কথাবার্তা কিছু শুনছেন না, অন্য কিছু ভাবছেন।

সাতজন ক্রু মেম্বারদের মধ্যে অধিনায়ক জন বরগকেই আমার কাছে মনে হল সবচেয়ে সাধারণ। প্রথম দর্শনে মানুষের ওপর প্রভাব ফেলার কোনো ক্ষমতা এই মানুষটির নেই।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হবার কথা বলি। মহাকাশযান পৃথিবীর মহাকর্ষণ অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে। শেষ বারের মতো পৃথিবী দেখার জন্যে সবাই ভিড় করেছে অবজারভেশন প্যানেলে। আমি শুধু নেই। ফেলে-আসা পৃথিবীর জন্যে আমি কোনো রকম আকর্ষণ বোধ করছি না। নিজের ঘরে চুপচাপ বসে আছি। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল। আমি বললাম, 'কে?' নরম গলায় উত্তর এল, 'আমার নাম জন বরগ।'

আমি দরজা খুললাম। জন বরগ হাসিমুখে বললেন, 'সবাই শেষ বারের মতো পৃথিবী দেখছে। আপনি দেখছেন না?'

'ইচ্ছা করছে না।'

'চমৎকার! আমারো ইচ্ছা করছে না। এবং আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? আমার মনে হচ্ছে আমরা আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসব।'

'আমার এরকম কিছু মনে হচ্ছে না।'

'আপনার কী রকম মনে হচ্ছে?'

'কোনো রকমই মনে হচ্ছে না।'

জন বরগ হাসিমুখে বললেন, 'আপনার কথা শুনে ভরসা পাচ্ছি। আমি ভেবেছিলাম বলে বসবেন, আমরা আর পৃথিবীতে ফিরে আসব না।'

'আমি এ রকম বললে অসুবিধা কী?'

'আপনি হচ্ছেন একজন ইএসপি ক্ষমতাধর ব্যক্তি। আপনি না-সূচক কিছু বললে একটু খটকা তো লাগবেই,...—'

আমি জন বরগের দিকে তাকালাম। তিনি নিচু অথচ স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'ইএসপি ক্ষমতাটমতা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। যে-জিনিস আমি বুঝতে পারি

না, সে-জিনিসের প্রতি আমার আগ্রহ নেই। কাজেই আপনার এই ক্ষমতা আমি কখনো ব্যবহার করব না। আপনি হয়তো জানেন না মহাকাশযানের অধিনায়ক হচ্ছেন দ্বিতীয় ঈশ্বর। সব কিছুই চলে তাঁর হুকুমে।'

আমি সহজ গলায় বললাম, 'মহাকাশযানের অধিনায়ক যদি দ্বিতীয় ঈশ্বর হন, তাহলে প্রথম ঈশ্বর কে ?'

'প্রথম ঈশ্বর বলে কেউ নেই। ওটা হচ্ছে কথার কথা।'

এই বলেই জন বরগ মৃদু হাসলেন। উঠে দাঁড়িয়ে আবার ঠোঁট টিপে মৃদু গলায় বললেন, 'যাই, কেমন ?'

আমি কিছু বললাম না। জন বরগ লোকটিকে যতটা সাধারণ মনে হয়েছিল, ততটা সাধারণ সে নয়। আমার ঘরে তার আসার একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল আমাকে জানিয়ে দেয়া যে, সে আমার ক্ষমতার ধার ধারে না। এটা সে জানিয়েছে চমৎকার ভঙ্গিতে।

বরগ মিশনের বাকি ছ'জন কর্মীর সঙ্গে প্রথম বাহাত্তুর ঘণ্টায় আমার কোনো রকম কথাবার্তা হল না। আমি নিজের ঘর থেকে বেরুলাম না। বেরুবার মতো তেমন কোনো কারণও ঘটল না। খাবার আসে ঘরে। তিশ-২ নামের একজন রোবট খাবার দিয়ে যায়, নিয়ে যায়।

আমি প্রায় সারাক্ষণই শুয়ে থাকি। মহাকাশযানের উড়ে চলার ধাতব শব্দ শুনি। লক্ষ কোটি ঝিঁঝি পোকার শব্দ। সে শব্দ বাড়ে এবং কমে। আমি কিছুই করি না। শুয়ে থাকি।

আমাকে বলা হয়েছে এই মহাকাশযানে সময় কাটানোর চমৎকার সব ব্যবস্থা আছে। এদের লাইব্রেরি পৃথিবীর যে কোনো বড় লাইব্রেরির মতোই। দুর্লভ সব সংগ্রহ এখানে আছে। ভিডিও সংগ্রহশালাটিও নাকি অসাধারণ। বিশেষ করে মানুষের মহাকাশ-যাত্রার ইতিহাস বিভাগ। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে ফিল্মও এখানে আছে। প্রজেকশন রুমে বসলেই হল। এখানে আছে সব রকম খেলাধুলার ব্যবস্থা। এমনকি সাঁতারের জন্যে ছোট একটি সুইমিংপুলের মতোও নাকি আছে, যার পানিতে ইলেকট্রিক্যাল চার্জ থাকায় সাঁতারের ব্যাপারটি হয় স্বর্গীয় আনন্দের মতো। আয়নিত জলকণা শরীরে ধাক্কা দেয়। প্রচণ্ড শারীরিক সুখের একটা অনুভূতি হয়।

আমাকে এসব আকর্ষণ করে না। আমার মনে হয় আমি তো ভালোই আছি। সুখেই আছি, খুব যখন নিঃসঙ্গ বোধ হয় তখন তিশ-২-এর সঙ্গে কথা বলি। খুবই সাধারণ কথাবার্তা। যেমন একদিন বললাম, 'কেমন আছ তিশ ?'

'কোনো অর্থে জিজ্ঞেস করছ ? যান্ত্রিক অর্থে আমি ভালো আছি।'

'যান্ত্রিক অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ আছে কি ?'

'নিশ্চয়ই আছে। আবেগ অর্থেও এই প্রশ্ন করা যায়। আমি রিবো-ত্রি সার্কিটসম্পন্ন রোবট, আমার কিছু পরিমাণ আবেগ আছে, যদিও তা মানুষের মতো তীব্র নয়।'

'আবেগ অর্থে তুমি কেমন আছ ?'

'আবেগ অর্থে খুব ভালো নেই।'

'কেন ?'

'অন্য একটি গ্যালাক্সিতে যাচ্ছি, এটা চিন্তা করেই বেশ কাহিল বোধ করছি। কে জানে কী অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।'

অবিকল মানুষের মতো কথা। যন্ত্রের মুখে মানুষের মতো কথা শুনতে ভালো লাগে না। যন্ত্র কথা বলবে যন্ত্রের মতো। মানুষ কথা বলবে মানুষের মতো। তিশ-২-এর সঙ্গে আমার কথাবার্তা এই কারণেই বেশি দূর এগোয় না। খানিকক্ষণ কথা বলার পরই আমি হাই তুলে বলি, 'ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পার।'

তিশ-২-এর স্বভাবচরিত্রও অনেকটা মানুষের মতো। 'তুমি যেতে পার' বলার পরও সে যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে। 'চুপ কর' বললে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার কথা শুরু করার চেষ্টা করে। খুবই যন্ত্রণার ব্যাপার। আমি যা জানতে চাই না তাও সে আমাকে বলতে থাকে। যেমন এই মহাকাশযান কী জ্বালানি ব্যবহার করে তা জানার আমার কোনো রকম আগ্রহ নেই, কিন্তু সে ঘ্যানঘ্যান করে বলবেই।

এই রোবটের কারণে, আগ্রহ নেই এমন সব বিষয়ও আমাকে জানতে হচ্ছে। আমি এখন জানি এই মহাকাশযান চার স্তরবিশিষ্ট। প্রথম স্তর হচ্ছে জ্বালানি স্তর। একটি থ্রাস্টার এবং একটি কনভার্টার (যা হিলিয়াম অণুকে হিলিয়াম আয়নে পরিণত করে) ছাড়াও আছে অসম্ভব শক্তিশালী চারটি ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেটর। একটি ফোটন এমিটার, যাদের প্রয়োজন পড়ে শুধুমাত্র হাইপার স্পেস ডাইভের সময়। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেইনটেনেন্স বিভাগ। তৃতীয় স্তরে ক্রুদের থাকবার ব্যবস্থা, খেলাধুলো এবং আমোদপ্রমোদের স্থান। চতুর্থ স্তরে আছে ল্যাবোরেটরি এবং অবজারভেশন প্যানেল। কমুনিকেশন বা যোগাযোগের যাবতীয় যন্ত্রপাতিও আছে এই স্তরে। কোনো নতুন গ্রহে অনুসন্ধানী স্কাউটশিপও এই চতুর্থ স্তর থেকেই পাঠানো হয়। মহাকাশযানের মস্তিষ্ক হচ্ছে কম্পিউটার। তাও চতুর্থ স্তরে। হাইপার স্পেস ডাইভ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিটি মহাকাশযানেই সিডিসি-১০ জাতীয় কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। এই কম্পিউটারগুলির কার্যপদ্ধতি মানুষ এখনো পুরোপুরি জানে না। কারণ এই কম্পিউটারের উদ্ভাবক মানুষ নয়। হাইপার স্পেস ডাইভ এবং সিডিসি-১০ কম্পিউটার দু'টিই মানুষ পেয়েছে মিডিওয়ে গ্যালাক্সির সিরান নক্ষত্রপুঞ্জের মহাবুদ্ধিমান প্রাণী ইয়েসীদের কাছ থেকে। মাকড়সা শ্রেণীর এইসব প্রাণীরা তাদের উচ্চতর প্রযুক্তির বিনিময়ে পৃথিবী থেকে নিয়ে যায় অতি সাধারণ কিছু উদ্ভিদ। তারা এই সব উদ্ভিদ দিয়ে কী করে, কেনই-বা তারা অতি সাধারণ কিছু উদ্ভিদের জন্যে এত মূল্য দিতে প্রস্তুত, সেই সম্পর্কে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা কিছুই জানেন না।

কারণ ইয়েসীরা এই বাণিজ্য সরাসরি করে না, করে কিছু রোবটের মাধ্যমে। এই সব রোবট কোনো প্রশ্নের জবাব দেয় না।

তাদের অনেক বার বলা হয়েছে, 'এই সামান্য লতা জাতীয় গাছগুলি দিয়ে তোমরা কী করবে ?'

রোবটরা উত্তর দিয়েছে, 'আমরা কী করব সেটা আমাদের ব্যাপার। হাইপার স্পেস ডাইভ সংক্রান্ত টেকনলজির বিনিময়ে তোমরা যদি উদ্ভিদ দাও দেবে, যদি না দিতে চাও দেবে না। এর বাইরের যাবতীয় কথাবার্তাই আমরা বাহুল্য মনে করি। এবং আমরা বাণিজ্য-সম্পর্কহীন প্রশ্নের কোনো জবাব দেব না।'

এইসব খবরের সবই আমি পেয়েছি তিশ-২ রোবটের কাছ থেকে। সে ক্রমাগতই কিছু-না-কিছু তথ্য আমাকে দিতে চেষ্টা করছে। এবং আমার ধারণা এটা সে করছে মহাকাশের ব্যাপারে আমার আগ্রহ বাড়ানোর জন্যে।

সে আমার ভেতর কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে চাচ্ছে। কৌতূহল হচ্ছে জীবনদায়িনী শক্তির মতো, যা আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। আমার মধ্যে কৌতূহলের কিছুই অবশিষ্ট নেই। জীবন আমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। একজন রোবটের সঙ্গে আমি আমার কোনো পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছি না। এই অবস্থাতেই মানুষ আত্মহননের কথা চিন্তা করে। আমিও করছিলাম।

তিশ তা বুঝতে পেরেছে। সে এই কারণেই প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে আমার মধ্যে কৌতূহল নামক সেই জীবনদায়িনী ব্যাপারটি জাগিয়ে তুলতে। তার কিছু কিছু চেষ্টা আমার খুব ছেলেমানুষী বলে মনে হয়। যদিও জানি ছেলেমানুষী কোনো ব্যাপার তিশ-২-এর মতো উন্নত রোবট কখনো করবে না। তিশ যা করছে খুব ভেবে-চিন্তেই করছে। সে ব্যবহার করছে রোবটদের লজিক, আবেগবর্জিত বিশুদ্ধ লজিক। এর ভেতর কোনো ফাঁকি নেই। একদিন...এই যা, দিন শব্দটা ব্যবহার করলাম ! দিন এবং রাত বলে মহাকাশযানে কিছু নেই। এখানে যা আছে তার নাম অনন্ত সময়। যে কথা বলছিলাম, এক দিন তিশ এসে বলল, 'মহাকাশযানে একজন জীব-বিজ্ঞানী আছে তা কি তুমি জান ?'

আমি বললাম, 'জানি।'

'তুমি তার সঙ্গে আলাপ কর না কেন ? তার সঙ্গে কথা বললে তোমার খুব ভালো লাগবে।'

'কারো সঙ্গেই কথা বলতে আমার ভালো লাগে না।'

'যে জীববিজ্ঞানীর কথা বলছি তার বয়স কম এবং সে একজন অত্যন্ত রূপবতী তরুণী।'

'তাতে কি ?'

'হাসিখুশি ধরনের মেয়ে। সবাই তাকে পছন্দ করে।'

'খুবই ভালো কথা।'

'এই তরুণীর গলার স্বরও খুব মিষ্টি। শুধু শুনতে ইচ্ছা করে।'

'বেশ তো, শুনতে ইচ্ছা করলে শুনবে।'

'আমি প্রায়ই শুনি। রোবট হওয়া সত্ত্বেও আমি এই মেয়েটির প্রতি এক ধরনের আবেগ অনুভব করি।'

'অত্যন্ত আনন্দের কথা।'

'এই তরুণীর নাম ইনো। নামটিও কি মধুর নয়?'

'খুবই মধুর। এখন তুমি বিদেয় হও।'

'বিদেয় হচ্ছি। আমি ক্ষুদ্র একটা অন্যায় করেছি, এটা বলেই বিদায় নেব। অন্যায়টা হচ্ছে আমি ইনোকে বলেছি যে তুমি তার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে বেশ আগ্রহী। সাহস সঞ্চয় করতে পারছ না বলে কথা বলতে পারছ না।'

'এ রকম বলার মানে কী?'

'যোগাযোগ করিয়ে দেয়া। মেয়েটা খুবই ভালো। কথা বললে তোমার চমৎকার লাগবে। ও আবার চমৎকার হাসির গল্পও জানে।'

'তুমি বিদেয় হও।

'হচ্ছি। আমার সঙ্গে এত উঁচু গলায় কথা বলার কিন্তু কোনো দরকার নেই। একজন রোবটের সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলাও যা, নিচু গলায় কথা বলাও তা। আমি তো আর তোমাদের মতো মানুষ না যে উঁচু গলায় কথা বললে আমার মন খারাপ হবে।'

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে তিশকে বিদায় করলাম। এবং বলে দিলাম এক্ষুণি যেন ইনো নামের মেয়েটিকে সত্যি কথাটা বলে। পৃথিবীর সবচেয়ে রূপবতী তরুণীর সঙ্গেও আমি কথা বলতে আগ্রহী নই।

তিশ আমার সব কথা শোনে না। অনেক কাজ সে তার নিজের লজিক খাটিয়ে করে। কাজেই সে ইনোকে কিছুই বলল না। এবং ইনো নামের অত্যন্ত রূপবতী বালিকা-বালিকা চেহারার মেয়েটি এক সময় আমার ঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসব?'

এই জাতীয় একটি মেয়ের মুখের ওপর 'না' বলা খুব মুশকিল। আমি হ্যাঁ-না কিছুই বললাম না।

'তিশ আমাকে বলল, আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। সাহসের অভাবে বলতে পারছেন না।'

'তিশ সত্যি কথা বলে নি। বানিয়ে বানিয়ে বলেছে। আপনার সঙ্গেই শুধু নয়, কারো সঙ্গেই আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না।'

'কেন করে না?'

'জানি না কেন। মানুষের সঙ্গ আমার কাছে অসহ্য বলে মনে হয়।'

'আমার সঙ্গও অসহ্য বোধ হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, হচ্ছে।'

'সত্যি বলছেন?'

'হ্যাঁ, সত্যি বলছি। আপনি চলে গেলেই আমি খুশি হব।'

মেয়েটি চলে গেল না। ঘরে ঢুকল। চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, 'আপনি আমাকে তাড়াবার জন্য এইসব বলছেন। কিন্তু আমি এত সহজে যাচ্ছি না। আমার

বয়স একত্রিশ। গত পঁচিশ বছরের কথা আমার মনে আছে। এই পঁচিশ বছরে কেউ আমাকে বলে নি যে আমার সঙ্গ তার পছন্দ নয়। যদিও আমি অনেকের সঙ্গ পছন্দ করি না। তবে পছন্দ না করলেও কাউকে মুখের ওপর সে-কথা বলতে পারি না। এত সাহস আমার নেই। আমি বোধ হয় একটু বেশি কথা বলছি, তাই না?'

'হ্যাঁ তাই।'

'বিশ্বাস করুন আমি এত কথা বলি না। কিন্তু মহাকাশযানে ওঠবার পর থেকে কেন জানি ক্রমাগত কথা বলছি। এটা বোধ হয়, হচ্ছে ভয় পাওয়ার কারণে। ভীত মানুষ দু'ধরনের কাণ্ড করে—হয় আমার মতো বেশি কথা বলে, নয় আপনার মতো কথা বলা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। আপনিও নিশ্চয়ই আমার মতো, তাই না?'

'না।'

'বলেন কী! হাইপার স্পেস ডাইভ দিতে যাচ্ছেন, এটা ভেবেও কি আপনার ভয় বা রোমাঞ্চ বোধ হচ্ছে না?'

'না, আমি কিছু ভাবি না।'

'সে কি! কেন?'

'ভাবতে ইচ্ছা করে না।'

'ইএসপি ক্ষমতাধর সব মানুষই কি আপনার মতো হয়?'

'তাও আমি জানি না। এরকম কারো সঙ্গে আমার এখনো দেখা হয় নি।'

ইনো খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'এখানে আসার পেছনে আমার অন্য একটা উদ্দেশ্যও আছে। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে উদ্দেশ্যটা বলব।'

ইনো আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তরল চোখ। কিছু কিছু চোখ আছে তাকালে মনে হয় জল-ভরা চোখ। যেন চোখের ভেতরের টলটল জল দেখা যাচ্ছে।

আমি কিছুই বললাম না। ইনো বলল, 'আমি এসেছি আপনার ইএসপি ক্ষমতা কী রকম তা পরীক্ষা করে দেখতে।'

'আমার কোনো ক্ষমতা নেই।'

'আপনি অস্বীকার করলে তো হবে না। আমাদের বলা হয়েছে আপনার ক্ষমতা অসাধারণ। প্রতিটি জেনার টেস্টে আপনি একশ' করে পেয়েছেন। কেউ তা পায় না।'

'জেনার টেস্টের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।'

'বেশ, না জানলে ক্ষতি নেই। এখন মন দিয়ে শুনুন আমি কি বলছি। আমার জ্যাকেটের পকেটে এক খণ্ড কাগজে আমি তিন লাইনের একটা কবিতা লিখে এনেছি। কী লিখেছি আপনি কি বলতে পারবেন?'

'কাগজটা না দেখে কী করে বলব? কী লেখা আছে তা জানতে হলে লেখাগুলি আমাকে পড়তে হবে।'

'লেখা পড়ে তো যে-কেউ বলতে পারবে। তাহলে আপনার বিশেষত্ব কোথায়?'

'বিশেষত্ব কিছুই নেই। এখন আপনি যদি দয়া করে উঠে যান এবং আমাকে একা থাকতে দেন তাহলে খুব খুশি হব।'

ইনো উঠে দাঁড়াল। অপমানে মেয়েটির মুখ কালো হয়ে গেছে। তার অপমানিত মুখ দেখতে আমার একটু যেন খারাপই লাগছে। সে আমাকে কী একটা বলতে গিয়েও বলল না। মুখ নামিয়ে নিল। আর ঠিক তখন বিদ্যুৎচমকের মতো তার জ্যাকেটের পকেটে রাখা কাগজটির লেখাগুলি আমি পড়তে পারলাম। ব্যাপারটা কী করে হল আমি নিজেও জানি না। প্রতিটি লাইন জ্বলজ্বল করছে।

"রাত্রি কখনো সূর্যকে পায় না।
তাতে ক্ষতি নেই।
কারণ সে পেয়েছে অনন্ত নক্ষত্রবীথি।"

একবার ইচ্ছা হল, কাগজটায় কী লেখা ইনোকে বলি। তারপরই ভাবলাম কী দরকার ? কী হবে বলে ?

ইনো নরম গলায় বলল, 'আপনি যে সত্যি সত্যি বিরক্ত হচ্ছিলেন তা বুঝতে পারি নি। বুঝতে পারলে আমি এতক্ষণ বসে থাকতাম না। আমি খুবই লজ্জিত, আমাকে ক্ষমা করবেন।'

সে মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে। পা ফেলছে এলোমেলো ভাবে। প্রচুর মদ্যপানের পর মানুষ ঠিক এই ভঙ্গিতেই হাঁটে। আমি এত কঠিন না হলেও পারতাম।

তিশ যখন খাবার নিয়ে এল তখন তাকে বললাম, 'তিশ, তুমি জীববিজ্ঞানী ইনোকে একটা কথা বলে আসতে পারবে ?'

তিশ উৎফুল্ল গলায় বলল, 'অবশ্যই পারব। কী কথা ?'

'কবিতার তিনটি লাইন—রাত্রি কখনো সূর্যকে পায় না/তাতে ক্ষতি নেই।/ কারণ সে পেয়েছে অনন্ত নক্ষত্রবীথি।'

তিশ অবাক হয়ে বলল, 'এর মানে তো কিছু বুঝতে পারছি না। সূর্য যা, নক্ষত্রও তো তাই। নাম ভিন্ন কিন্তু জিনিস তো একই।'

'তোমার বোঝার দরকার নেই। ইনোকে বললেই তিনি বুঝবেন।'

'আর যদি বুঝতে না পারে ? যদি আমাকে বুঝিয়ে দিতে বলে, তা হলে তো মুশকিলে পড়ব।'

'তোমাকে যা করতে বলছি তাই কর।'

'বেশ, করব। আমাকে শুধু একটা কথা বল—এটা কি কোনো প্রেম-বিষয়ক কবিতা ?'

'জানি না।'

'ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। প্রেম-বিষয়ক কবিতা বলেই তো মনে হচ্ছে।'

তিশকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি সে অত্যন্ত আগ্রহ বোধ করছে। যন্ত্র মানুষের মতো আগ্রহ বোধ করছে, খুবই অবাক হবার মতো ব্যাপার। আর আমি মানুষ হয়ে যন্ত্রের কাছাকাছি চলে যাচ্ছি। গলা উঁচিয়ে ডাকলাম, 'তিশ শুনে যাও।'

তিশ থমকে দাঁড়াল। আমি বললাম, 'ইনোর কাছে তোমাকে যেতে হবে না।'

'কেন ?'

'প্রশ্ন করবে না। তোমাকে যেতে নিষেধ করছি, তুমি যাবে না।'

'তিন লাইনের কবিতাটা তাকে শোনাব না ?'

'না। এখন দয়া করে বিদেয় হও।'

আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বাতি নিভিয়ে দিলাম। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার নয়। হালকা আলো আছে। এই রকম আলোয় মন বিষণ্ন হয়। হাজার হাজার মাইল দূরে ফেলে-আসা একটি গ্রহের কথা মনে হয়। সেই গ্রহের একজন মানবীর কথা মনে পড়ে, যার সঙ্গে এই জীবনে আর দেখা হবে না।

হাত বাড়িয়ে মাথার বাঁ পাশের নীল একটা সুইচ টিপলাম। হালকা সংগীত বাজতে শুরু করল। মাঝে মাঝে এই সংগীত আমি শুনি। এর জন্ম পৃথিবীতে নয়। অজানা এক গ্রহে। অজানা গ্রহের অচেনা উন্নত কোনো প্রাণী এই সুর সৃষ্টি করেছে। গভীর বিষাদময় সুর।

৩

প্রচণ্ড অস্বস্তির মধ্যে জেগে উঠলাম। কিছু একটা হয়েছে। কী হয়েছে বুঝতে পারছি না। কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছি ? মনে করতে পারছি না। হয়তো দেখেছি। দুঃস্বপ্ন প্রায় সময়ই মনে থাকে না, কিন্তু তার প্রভাব মানুষকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রাখে। ঘড়ির দিকে তাকালাম। ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে ৩৩৬.৭২৫২, এই ঘড়ি আমার কাছে এখনো অর্থহীন। শুধু জানি এই ঘড়ি মহাকাশযানের সময় বলছে। ৩৩৬.৭২৫২, ঘণ্টা আগে মহাকাশযান যাত্রা শুরু করেছে। যাত্রা শুরুর সময় ছিল শূন্য ঘণ্টা। এখানে আরো দু'টি ঘড়ি আছে। একটিতে দেখানো হচ্ছে পৃথিবীর সময়। সেখানে সময় প্রসারণ বা ডাইলেশনের ব্যাপারগুলি হিসাবের মধ্যে ধরা আছে। আমি সেই হিসাব বুঝি না। অবশ্যি বোঝবার চেষ্টাও করি না। কারণ ঘড়ির সময় বোঝা বা বোঝার চেষ্টা করা এখানে অর্থহীন। যেই মুহূর্তে হাইপার স্পেস ডাইভ দেয়া হবে সেই মুহূর্তেই সময় অদ্ভুতভাবে জট পাকিয়ে যাবে। সেই জটের অর্থ উদ্ধার করা মানুষের পক্ষে এখনো সম্ভব হয় নি।

আমি বিছানা ছেড়ে নামলাম। তৃষ্ণা পেয়েছিল—কয়েক ঢোক পানি খেলাম। অস্বস্তিটা কমল না, বরং বেড়ে যেতে লাগল। যেন বিরাট কিছু হতে যাচ্ছে। ভয়ংকর কিছু। নিজেকে একটু হালকা হালকাও লাগছে। কৃত্রিম উপায়ে মহাকাশযানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তৈরি করা হয়। এখানে ওজন-শূন্যতা নেই। কিন্তু নিজেকে হালকা লাগছে কেন ? আমি সুইচ টিপে তিশকে ডাকলাম। উদ্বিগ্ন গলায় বললাম, 'কিছু হয়েছে নাকি তিশ ?'

তিশ বলল, 'কী হবে ?'

'আমার কী কারণে যেন খুব অস্বস্তি লাগছে।'

'এরকম সবারই মাঝে মাঝে লাগে। একে বলে গতিজনিত শারীরিক বিপর্যয়। আমাদের গতিবেগ এখন ০.৪৩C, অর্থাৎ আলোর গতিবেগের প্রায় তেতাল্লিশ শতাংশ। গতিবেগ যখন ০.৬০C হবে বা তার চেয়ে বেশি হবে তখন শারীরিক বিপর্যয় শুরু হবে। হার্ট বিট দ্রুত কমতে থাকবে, ব্লাড প্রেশার কমবে, বিপাক প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে এবং গায়ের তাপমাত্রা প্রায় সাত ডিগ্রির মতো কমে যাবে। তবে ভয়ের কিছু নেই, ওষুধপত্রের ভালো ব্যবস্থা আছে। আমি কি তোমার জন্যে ডাক্তার রোবটকে খবর দেব ?'

'না।'

'আমাদের এই ডাক্তার রোবট মনোবিশ্লেষণের ব্যাপারেও একজন বিশেষজ্ঞ। আমার মনে হয় তোমার উচিত তার সঙ্গে কথা বলা।'

'তুমি বিদেয় হও।'

তিশকে বিদেয় দিয়ে আমার অস্বস্তি আরো দ্রুত বাড়তে লাগল। যতই সময় যাচ্ছে ততই বাড়ছে। এই প্রথম বার মনে হল আমরা একটা চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিকে এগুচ্ছি। কোনো এক আকর্ষণী শক্তির মধ্যে পড়ে গেছি—যার শক্তি অকল্পনীয়। আমার মনে হল মহাকাশযানের প্রতিটি পরমাণুর ওপর এই শক্তির অশুভ ছায়া পড়েছে। এই শক্তি যেন নিয়তির মতো অমোঘ। এর হাত এড়াবার কোনো উপায় নেই। অথচ মহাকাশযানের সব কিছুই খুব স্বাভাবিকভাবে চলছে বলে মনে হচ্ছে। আমার মাথার ওপর বিন্দুর মতো একটি আলো জ্বলছে, যার মানে মহাকাশযানে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি নেই। প্রতিটি যন্ত্র ঠিকমতো কাজ করছে। তা তো হতে পারে না।

আমি নিজের ঘর ছেড়ে বেরুলাম। হলঘরে মিনিটখানেক কিংবা তার চেয়েও কিছু কম সময় দাঁড়িয়ে ভাবলাম কী করা উচিত। একবার মনে হল আমার কিছুই করার নেই, যা হবার হোক। আমি বরং আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। এই ভাবনা দীর্ঘস্থায়ী হল না। আমি রওনা হলাম জন বরগের ঘরের দিকে। আগে থেকে যোগাযোগ না করে তাঁর ঘরে যাবার নিয়ম নেই, কিন্তু ততটা সময় মনে হচ্ছে আমার হাতে নেই।

'আমি কি আসতে পারি জন বরগ ?'

এক মুহূর্তের জন্যে জন বরগের চোখে বিরক্তির ছায়া পড়ল। তিনি সেই বিরক্তি মুছে ফেলে বললেন, 'নিশ্চয়ই। যদিও মহাকাশ নীতিমালায় আপনি তা পারেন না। তবে সব নীতিমালা সব সময় প্রযোজ্য নয়। আপনি কেমন আছেন ?'

'ভালো।'

'বসুন। মহাকাশের দৃশ্য দেখুন। আমি বেশির ভাগ সময় ভিউ প্যানেলের সামনে বসে কাটাই। বাইরের ছবি দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে আমার মাথা খারাপের মতো হয়ে যায়।'

'আমি একটা বিশেষ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

'বলুন।'

'আমার প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে বিরাট একটা বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।'

'খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। মহাকাশযানের গতিবেগ আলোর গতিবেগের চল্লিশ শতাংশেরও বেশি। সেই বেগ ক্রমেই বাড়ছে। এই অবস্থায় শারীরিক কিছু অসুবিধা দেখা দেয়। এবং তখন যা করতে হয়, তা হচ্ছে—একজন ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। মিশন-প্রধানের কাছে নয়।'

'আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আমার মনে হচ্ছে প্রচণ্ড শক্তিধর কিছু তার দিকে আমাদের টানছে। এর শক্তি অকল্পনীয়, সীমাহীন। আমার মনে হচ্ছে একে এড়াবার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই।'

জন বরগ হেসে ফেললেন। একজন বয়স্ক লোকের মুখে শিশুদের মতো কথা শুনলে আমরা যে রকম করে হাসি, অবিকল সে রকম প্রশ্রয়-মাখানো হাসি। জন বরগ হাসতে হাসতেই বললেন, 'মহাকাশযান সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই বলেই এ রকম উদ্ভট কথা আমাকে বলতে এসেছেন।'

'আমি কোনো উদ্ভট কথা বলছি না।'

'আপনি খুবই উদ্ভট কথা বলেছেন এবং তা বুঝতে পারছেন না। ইএসপি ক্ষমতা বা ঐ জাতীয় হাবিজাবি আমাকে বলতে আসবেন না। মহাকাশযান ইএসপি ক্ষমতার ওপর চলে না, চলে বৈজ্ঞানিক সূত্র এবং তথ্যের ওপর। আপনার জানা নেই যে এই মহাকাশযানের এক পার্সে দূরত্ব পর্যন্ত যে কোনো জায়গার অতি সূক্ষ্মতম পরিবর্তনের হিসেবও রাখা হয়। ধরা যাক, কোনো কারণে আমরা একটা নিউট্রন স্টারের কাছাকাছি চলে এলাম। নিউট্রন স্টারের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হচ্ছে দানবীয় শক্তি, কিন্তু এই শক্তিও আমাদের কিছু করতে পারবে না। কারণ হাইপার স্পেস ডাইভ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিটি মহাকাশযানের আছে গ্র্যাভিটি ফ্লাক্স তৈরির ক্ষমতা। এই গ্র্যাভিটি ফ্লাক্সের কারণে আমরা শুধু নিউট্রন স্টার নয়, ব্ল্যাক হোলের খপ্পর থেকেও নির্বিঘ্নে বের হয়ে আসতে পারি। এখন কি আপনার মনের অস্বস্তি দূর হয়েছে?'

'না।'

'এখনো যদি অস্বস্তি দূর না হয়, তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। আপনি ডাক্তার রোবটের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সে আপনাকে ট্র্যাংকুইলাইজার ধরনের কিছু দেবে। তাই খেয়ে শুয়ে পড়ুন।'

আমি নিজের ঘরে চলে এলাম। তার ঠিক সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপরের নীলবাতি নিভে গেল। সেখানে জ্বলল হলুদ বাতি, যার মানে সতর্ক অবস্থা। হলুদ বাতির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই লালবাতি জ্বলল। লালবাতি মানে হচ্ছে বিপজ্জনক পরিস্থিতি। আমি নিশ্চিত জানি এই লালবাতি নিভে গিয়ে দু'টি লাল বাতি জ্বলবে,

যার মানে চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতি। তারপর জ্বলবে তিনটি লালবাতি, যার অর্থ আমরা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

ইন্টারকমে কম্পিউটার সিডিসির ধাতব গলা শোনা গেল। সে অত্যন্ত স্পষ্ট করে যে সংবাদ দিল তা হচ্ছে :

'বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আমরা অজানা একটি শক্তিশালী আকর্ষণী বলয়ের ভেতর পড়ে গিয়েছি। আকর্ষণী শক্তির ধরন, গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য আমাদের কাছে নেই বলে ঠিক এই মুহূর্তে কিছু করা যাচ্ছে না। তবে অতি দ্রুত তথ্যসংগ্রহ করা হচ্ছে। মিশন-প্রধান জন বরগ একটি জরুরি সভা ডেকেছেন। সভা এক্ষুণি শুরু হবে। সেই সঙ্গে মিশন-প্রধান জন বরগ মহাকাশযানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। আমার বক্তব্য শেষ হল।'

আমি সভাকক্ষের দিকে এগুলাম। ঘর ছেড়ে যাবার আগে শেষ বারের মতো তাকালাম। আমি জানি এই ঘরে আর ফিরে আসব না। কেমন যেন মায়া লাগছে। অল্প কিছুদিন মাত্র কাটিয়েছি, অথচ তাতেই কেমন মায়া জন্মে গেছে।

ঘরে লাল বাতি এখনো জ্বলছে। একটি মাত্র বাতি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাতিটি এখনো জ্বলে নি। তবে জ্বলবে। আমি তা রক্তের প্রতি কণিকায় অনুভব করছি।

তিশ এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে। সে বিষণ্ন গলায় বলল, 'সভা শুরু হয়ে গেছে, আপনার যাওয়া দরকার।'

আমি হালকা গলায় বললাম, 'কী হবে সভায় গিয়ে ?' তিশ ক্লান্ত গলায় বলল, 'মনে হচ্ছে কিছু হবে না'। ঠিক তখন দ্বিতীয় লাল বাতিটি জ্বলল—এর মানে চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতি।

৪

জন বরগ শান্ত মুখে বসে আছেন। তাঁর চোখে-মুখে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। যেন কিছুই হয় নি, তিনি সাধারণ একটি সভায় এসেছেন। রুটিন কাজ। এ-রকম একটি সভায় আমি আগে একবার উপস্থিত ছিলাম। সেই সভার সঙ্গে আজকের সভার আমি কোনো প্রভেদ দেখছি না। উদ্বেগের কিছু ছাপ আমি ইনোর চোখে-মুখে দেখছি। সে দ্রুত চোখের পাতা ফেলছে, কিছুক্ষণ পরপর ঢোক গিলছে।

জন বরগ কথা বলা শুরু করলেন। শান্ত স্বর। আমি মনে মনে এই মানুষটির সাহসের প্রশংসা করলাম। এই মানুষটির স্নায়ু খুব সম্ভব ইস্পাতের তৈরি।

'বন্ধুগণ, দু'টি লালবাতি জ্বলেছে—কাজেই পরিস্থিতি কী সেই ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। তবু কিছু ব্যাখ্যা করছি, কারণ এই মুহূর্তে আমাদের কিছু করার নেই। এই মহাবিপদে আমাদের যারা সাহায্য করতে পারে তারা ক্লান্তিহীন কাজ করে যাচ্ছে। তারা হচ্ছে সেন্ট্রাল কম্পিউটার সিডিসি-১০ এবং সাহায্যকারী

কম্পিউটার সিডিসি-৭, জরুরি পরিস্থিতির কারণে হিসাব-নিকাশের কিছু অংশ তিশ-১০০ রিজার্ভ কম্পিউটার করে দিচ্ছে।

'ব্যাপারটা কি হল বলি। আমরা হঠাৎ করে একটা অকল্পনীয় আকর্ষণীয় শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে পড়ে গিয়েছি। এই আকর্ষণী শক্তির উৎস কোথায় আমরা জানি না। শুরুতে মনে হচ্ছিল আমরা একটি কৃষ্ণ গহ্বরে পড়ে গেছি। কিন্তু এটি কৃষ্ণ গহ্বর নয়। আমাদের চারপাশে কিছুই নেই। অথচ এই মহাশূন্য অতি তীব্র শক্তিতে আমাদের আকর্ষণ করছে। শক্তির পরিমাণ $১০^{১১}G$ থেকে $১০^{২৭}G$, সমুদ্রতরঙ্গের মতো এটা বাড়ছে এবং কমছে। মনে হচ্ছে আমরা একটা স্পাইরেলের ভেতর ঢুকে পড়েছি। এবং সোজাসুজি অগ্রসর হচ্ছি। স্পাইরেলের এক একটা বাহুর কাছাকাছি আসামাত্র আকর্ষণী শক্তি বেড়ে যায়, আবার বাহু অতিক্রম করামাত্র কিছুটা কমে যায়।'

ইনো বলল, 'এর থেকে বেরুবার জন্যে আমরা কী করছি তা কি জানতে পারি?'

'অবশ্যি জানতে পারেন। আমি সিডিসি-৭কে সভা শুরু হবার আগেই বলে রেখেছি এই বিষয়ে কথা বলবার জন্যে।'

সিডিসি সঙ্গে সঙ্গে কথা বলা শুরু করল। এর গলার স্বরে কোনো ধাতব ঝংকার নেই। সে কথা বলছে অনেকটা পুরুষালি গলায়। মাঝে মাঝে থামছে। আবার শুরু করছে। থামাটা ইচ্ছাকৃত। আমাদের সমস্ত ব্যাপারটা আত্মস্থ করবার জন্যে সময় দিচ্ছে।

'সম্মানিত অভিযাত্রী, খুবই দুঃসময়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি। অল্প সময়ে আমি বক্তব্য শেষ করতে চাচ্ছি। সেই কারণে কোনো কিছুই পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না।

'আমরা বেকায়দায় পড়ে গেছি, কারণ ব্যাপারটা আচমকা ঘটেছে। প্রচণ্ড শক্তিশালী নিউট্রন স্টার কিংবা ব্ল্যাক হোল মহাকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মহাকাশযানের অতি উন্নত সেনসর অনেক দূর থেকে তাদের অস্তিত্ব টের পায় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এখানে তা সম্ভব হয় নি, কারণ আচমকা আমরা একটি স্পাইরেলের ভেতর পড়ে গেছি। এবং আমরা এগিয়ে যাচ্ছি কেন্দ্রবিন্দুর দিকে।

'এইসব ক্ষেত্রে মহাকাশযানের দিকপরিবর্তন করা হয় এবং শক্তিশালী গ্র্যাভিট্রন ফ্লাস্ক ব্যবহার করা হয়। দিকপরিবর্তন আমরা ঠিকই করতে পারছি, তবে গ্রাভিট্রন ফ্লাস্ক ব্যবহার করতে পারছি না। কারণ অলটারনেটিং চৌম্বক ক্ষেত্রে গ্র্যাভিট্রন ফ্লাস্ক কাজ করে না।

'আমরা মহাকাশযানের গতিবেগও কমাতে পারছি না, কারণ এই মুহূর্তে মহাকাশযানের গতিবেগ ০.৬২৬C—আলোর গতিবেগের শতকরা বাষট্টি ভাগেরও বেশি। এই গতিবেগ কমিয়ে শূন্যতে নিয়ে আসতে আমাদের সময় লাগবে ১১২.৭০ ঘণ্টা। এত সময় আমাদের হাতে নেই।'

ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার ম্যানোফ ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'একটি হাইপার স্পেস ডাইভ দিলে কেমন হয় ? ঐ ব্যাপারে কি চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে ?'

'হ্যাঁ, হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। হাইপার স্পেস ডাইভ দিতে হলে গতিবেগ ০.৮২C প্রয়োজন। সেই গতিবেগ এই মুহূর্তে আমাদের নেই। থাকলেও আমরা হাইপার স্পেস ডাইভ দিতে পারতাম না, কারণ আমাদের গ্র্যাভিট্রন ফ্লাক্স কাজ করছে না।

'প্রসঙ্গক্রমে আপনাদের জানিয়ে রাখি যে ১.২G আকর্ষণী শক্তির মধ্যেও হাইপার স্পেস ডাইভ দেয়া যায় না। হাইপার স্পেস ডাইভ দেয়ার মুহূর্তে মহাকাশযানকে পুরোপুরি নিরপেক্ষ বলয়ে থাকতে হয়।'

ম্যানোফ বললেন, 'আমি তা জানি। পরিস্থিতি আমাকে অন্যভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করছে। আমি জানতে চাচ্ছি আমাদের পরিকল্পনা কী ?'

'কোনো পরিকল্পনা নেই।'

'কী অদ্ভুত কথা ! পরিকল্পনা নেই মানে কী ? আমরা কিছুই করব না ?'

'আমাদের এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে যে-সব তথ্য জোগাড় হয়েছে, সে-সব পৃথিবীতে পাঠানো। যাতে পৃথিবীর মানুষ এখানে কী ঘটল তা বুঝতে পারে। এর ফলে তারা ভবিষ্যতের মহাকাশযানগুলিকে এই পরিস্থিতি সামলাবার মতো করে তৈরি করবে। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে পৃথিবীতে তথ্য পাঠানোর ব্যাপারটি আমরা চমৎকারভাবে সম্পন্ন করছি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা করা হবে।'

ইনো বলল, 'আমাদের ভবিষ্যৎ কী ?'

'ভবিষ্যতের কথা আমরা বলি না। আমরা বলি বর্তমান।'

'আমাদের বর্তমানটাই বা-কী ?'

'ভালো নয়।'

'ভালো নয় মানে কী ?'

'ভালো নয় মানে খারাপ—খুবই খারাপ।'

'উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা কত ?'

'আমাদের কাছে যা তথ্য আছে তার থেকে মনে হয় সম্ভাবনা ০.০৩৭, সম্ভাবনা নেই বলাই ভালো।'

'আমি তাকালাম জন বরগের দিকে। জন বরগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকেই দেখছেন। চোখে চোখ পড়ামাত্র তিনি অল্প হাসলেন। তারপর বললেন, 'একটা কাজ করলে কেমন হয় ? আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, অত্যন্ত দামি একটি শ্যাম্পেনের বোতল এই মহাকাশযানে আছে। বোতলটি নেয়া হয়েছিল অন্য গ্যালাক্সিতে পদার্পণের উৎসব উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে। এখন দেখতে পাচ্ছি সেই সম্ভাবনা ০.০৩৭ ; কাজেই আমি প্রস্তাব করছি, বোতলটি এখনি খোলা হোক। কারো আপত্তি থাকলে হাত তুলে জানাতে পারেন।'

কেউ হাত তুলল না। তেমন কোনো বাড়তি উৎসাহও কারো মধ্যে লক্ষ করলাম না। সবাই গ্লাস হাতে নিল মোটামুটি যন্ত্রের মতো। যেন নিয়ম রক্ষা করছে। মিশন-প্রধানের হুকুম পালন করছে।

জন বরগ গ্লাস হাতে উঠে দাঁড়ালেন এবং মোটামুটি নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনারা বোধ হয় জানেন না, একজন অসাধারণ ইএসপি ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ আমাদের মধ্যে আছেন, যিনি এই মহাবিপদের কথা প্রায় ছেষট্টি মিনিট আগে টের পেয়েছিলেন। আমি তখন তাঁর কথায় তেমন গুরুত্ব দিই নি। এখন দিচ্ছি। এখন আমি তাঁর কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি, আমাদের ভবিষ্যৎ কী? তাঁর ইএসপি ক্ষমতা কী বলছে?'

আমি উত্তর দেবার আগেই তিন নম্বর লালবাতি জ্বলে উঠল। চরম বিপর্যয়ের শেষ সংকেত। তার পরপরই মহাকাশযানের কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম স্তরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হল। এর মধ্যেই আমি মিশন-প্রধান জন বরগের গলা শুনলাম, 'আসুন আমরা এই বিপর্যয়ের নামে মদ্যপান করি।'

তাঁর কথা শেষ হল না, তৃতীয় স্তরে আরেকটি বিস্ফোরণ হল। আগুনের নীল শিখা মুহূর্তের মধ্যে আমাদের গ্রাস করল।

এর পরের কথা আমার আর কিছু মনে নেই। মনে থাকার কথাও নয়।

৫

অন্ধকার।

গাঢ় অন্ধকার।

আলো ও শব্দহীন অনন্ত সময়ের জগৎ। আমার কোনো রকম বোধ নেই। বেঁচে আছি কিনা তাও বুঝতে পারছি না। এটা কি মৃত্যুর পরের কোনো জগৎ? অন্য কোনো জীবন? আমার মধ্যে সর্বশেষ স্মৃতি যা আছে, তা হচ্ছে একটি বিভীষিকার স্মৃতি। চারদিকে লেলিহান শিখা। গ্যালাক্সি-টু নামের অসাধারণ মহাকাশযানটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সব স্মৃতি তো এইখানেই শেষ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তার পরেও মনে হচ্ছে চেতনা বলে একটা কিছু এখনো আমার মধ্যে আছে। সব শেষ হয় নি, কিংবা শেষের পরেও কিছু আছে।

আমি চিৎকার করতে চাই, কোনো শব্দ হয় না। হাত-পা নাড়তে গিয়ে মনে হয় আমার হাত-পা বলে কিছু নেই। চারদিকে সীমাহীন শূন্যতা। আমার চেতনা শুধু আছে, আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তা কী করে হয়! অন্ধ ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমি প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করতে যাই, তখন মনে হয় কেউ একজন যেন আমাকে ভরসা দেয়। আমি তার কণ্ঠ শুনতে পাই না, উপস্থিতি বুঝতে

পারি না—কিন্তু তবুও মনে হয় কেউ একজন পরম মমতায় আমাকে লক্ষ করছে। বলছে, 'ধৈর্য ধর। সহ্য কর। আমি আছি। আমি পাশেই আছি।'

'কে, তুমি কে '

'ধৈর্য ধর। সহ্য করে যাও।'

'আমি কি জীবিত না মৃত ?'

'সহ্য কর।'

'কী সহ্য করব আমার তো কোনো শারীরিক কষ্ট হচ্ছে না। শরীর বলে কি আমার কিছু নেই ?'

'ঘুমিয়ে পড়। ঘুমিয়ে পড়।'

'ঘুমিয়ে পড়তে বলছ কেন আমি কি জেগে আছি।'

'ঘুমিয়ে পড়, ঘুমিয়ে পড়। দীর্ঘ ঘুম। নিরবচ্ছিন্ন ঘুম।'

'তুমি কে'

আমি কোনো জবাব পাই না। তখন মনে হয় সমস্তটাই কি কল্পনা। তাই-বা হবে কী করে। আমি কল্পনা করছি কীভাবে। একজন মৃত মানুষ কি কল্পনা করতে পারে কীভাবে করে। কল্পনা ছাড়া সে কি অন্য কিছু করতে পারে না। আমার বাকি জীবন কি কল্পনা করে করেই কাটবে। অযুত নিযুত লক্ষ কোটি বছর ধরে আমার কাজ হবে শুধু কল্পনা করানো। অনন্ত মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ানো। আমি কি তাই করছি। ঘুরে বেড়াচ্ছি মহাশূন্যে।

কোনো কূল-কিনারা পাই না। এক সময় যে-চেতনা অবশিষ্ট আছে, তাও লোপ পায়। গভীর ঘুমে তলিয়ে পড়ি। আমার মনে হয় অনন্তকাল কেটে যায় ঘুমের মধ্যে। আবার ঘুম ভাঙে। আমি ভয়ে-ভয়ে বলি, 'কে ?' কোনো শব্দ হয় না। চারদিকে দেখি, ঘন অন্ধকার। ক্ষীণ স্বরে বলি, 'আমি কোথায় ?'

আবার আগের মতো কেউ আমাকে ভরসা দেয়। তার কথা শুনতে পাই না। তাকে দেখতে পাই না, কিন্তু অনুভব করি, সে বলছে, 'ভয় নেই। কোনো ভয় নেই।'

'কে তুমি কে ?'

'ধৈর্য ধর। সহ্য করে যাও। আমরা তোমার পাশেই আছি।'

'তোমরা কারা ?'

'সময় হলেই জানবে।'

'কখন সময় হবে ?'

'হবে, শিগগিরই হবে। ঘুম এবং জাগরণের আরো কয়েকটি চক্র পার হতে হবে।'

'আমার সঙ্গীরা কোথায় ?'

এর কোনো জবাব পাওয়া যায় না। আমার চেতনা আবার আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কী ভয়ংকর জটিলতা ! আমি কাতর কণ্ঠে বলি, 'অন্ধকার সহ্য করতে পারছি না। আলো চাই—সামান্য কিছু আলো।'

'ধৈর্য ধর। সহ্য করে যাও। অপেক্ষা কর।'

আমি অপেক্ষা করি। অপেক্ষা করতে করতেই হয়তো-বা নিযুত লক্ষ কোটি বছর পার হয়ে যায়, কিংবা কে জানে এই জগতে হয়তো সময় বলে কিছু নেই।

হয়তো আমার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পর নতুন একটি অবস্থায় আমি আছি। এই অবস্থায় শরীর নেই, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কিছুই নেই, আছে শুধু চেতনা। এই চেতনা নিয়ে আমি ভেসে আছি অনন্ত মহাশূন্যে। আমার চারপাশে বিপুল অন্ধকার, নৈঃশব্দের ভয়াবহ মহাশূন্য...

৬

আমি মনে হচ্ছে বেঁচেই আছি।

মনে হচ্ছে বলছি কারণ আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই। বড়ো রকমের একটা জট কীভাবে যেন লেগে আছে, জট খুলতে পারছি না। হয়তো পাগল-টাগল হয়ে গেছি। কোনো ইন্দ্রিয় ঠিকমতো কাজ করছে না। কিংবা মৃত মানুষদেরও হয়তো চেতনা বলে কিছু আছে। অদ্ভুত সব দৃশ্য সে দেখে এবং অদ্ভুত সব শব্দ সে শোনে।

যে-সব ঘটনা এ পর্যন্ত ঘটেছে, আমি সে-সব সাজাতে পারছি না। মহাকাশযানে করে যাচ্ছিলাম। গন্তব্য—এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ। একটা দুর্ঘটনা ঘটল। ভয়াবহ দুর্ঘটনা। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই। দুর্ঘটনায় আমার জীবনের ইতি হয়ে যাবার কথা। তাও হল না। মনে হল খানিকটা চেতনা অবশিষ্ট আছে। মাঝে-মাঝে কে যেন আমায় সান্ত্বনা দেয়, বলে, 'ধৈর্য ধর, আমরা আছি।' কে বলে? জানতে পারি না, কারণ চারদিকে গাঢ় অন্ধকার।

এখন অন্ধকার নেই, আমি সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পারছি। তবে যা দেখছি তা বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। মনে হচ্ছে, যে-জট লেগেছে তা কোনো দিন খুলবে না। কারণ আমি চারপাশে দেখছি আমার পরিচিত জগৎ। আমার এ্যাপার্টমেন্টের সাত তলার ঘর। কোঁচকানো বিছানার চাদরের এক কোনায় কফির দাগ লেগে গিয়েছিল। সেই দাগও আছে। বাথরুমের শাওয়ারটা নষ্ট। সব সময় ঝিরঝির করে পানি পড়ে। এখনো পড়ছে, শব্দ শুনছি। খাটের পাশে শেলফে অনেকগুলি বই। মেঝেতে একটা পেপারব্যাক বই পড়ে আছে, নাম 'দি ওরিওনা'। ভৌতিক উপন্যাস। কিনে এনেছিলাম, কিন্তু এক পৃষ্ঠাও পড়ি নি। খুব নাকি চমৎকার বই। নিকি পড়েছে। তার ধারণা এটা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বই। এ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে আসবার সময় বইটি যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। আমার জন্যে এর চেয়েও বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। বইটি হাতে নিয়ে পাতা উল্টে দেখি প্রতিটি পৃষ্ঠা সাদা।

শেলফের বইয়েরও একই অবস্থা। বেশির ভাগ বইয়েরই সব পৃষ্ঠা সাদা। অবশ্যি কিছু কিছু বই পাওয়া গেল যেগুলিতে লেখা আছে। একটি বইয়ের ত্রিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখা, বাকি পাতাগুলি সাদা। এর মানে কী !

আমি জানালার পাশে এসে দাঁড়ালাম। কী অদ্ভুত কাণ্ড, জানালার ওপাশে ঘন অন্ধকার—কিছুই নেই ! আমার এই ঘরটি ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডে যেন আর কিছু নেই। এর কোনো মানে হয় না। এটা গভীর রাত হলেও বাইরে লোকজন চলাচল করবে। স্ট্রিট লাইট জ্বলবে। কিন্তু এটা রাত নয়, কারণ আমার ঘরে বাতি জ্বলছে না, অথচ ঘরের ভেতর দিনের মতো আলো। আমার খাটে তেরছা করে সূর্যের আলো পড়েছে, অথচ বাইরে কোনো সূর্য নেই।

আমি উঁচু গলায় বললাম, 'এসব কী হচ্ছে ?' কেউ আমার কথার জবাব দেবে ভাবি নি, কিন্তু জবাব পেলাম। কোনো শব্দ হল না, অথচ পরিষ্কার বুঝলাম কেউ একজন বলছে, 'তোমার ঘরটি কি আমরা ঠিকমতো তৈরি করি নি ?'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'কে ? তুমি কে ?'

'আমি কে তা জানতে পারবে। তার আগে বল কেমন বোধ করছ ?'

'আমি কি বেঁচে আছি ?'

'নিশ্চয়ই বেঁচে আছ, তোমাকে বাঁচিয়ে তুলতে খুবই কষ্ট করতে হয়েছে। তোমার বেশির ভাগ অঙ্গপ্রত্যঙ্গই নতুন করে তৈরি করতে হয়েছে। এটা তেমন কোনো জটিল ব্যাপার নয়, তবুও খুব ক্লান্তিকর দীর্ঘ ব্যাপার।'

'আমি আমার চারপাশে যে সব দেখছি, তা কি আমার কল্পনা না সত্যি সত্যি দেখছি ?'

'যা দেখছ সত্যি দেখছ। এইসব জিনিসের স্মৃতি তোমার মস্তিষ্কের কোষে, যাকে তোমরা বল নিওরোন—সেখানে ছিল। আমরা তা দেখে দেখেই তোমার চারপাশের পরিবেশ তৈরি করেছি। তুমি একটু আগেই লক্ষ করেছ কিছু-কিছু বইয়ের সব পাতা সাদা। ঐ বইগুলি তুমি পড় নি, কাজেই তোমার মাথায় কোনো স্মৃতি নেই। আমরা যে কারণে লেখা তৈরি করতে পারি নি। যে-সব বই পড়েছ, তার স্মৃতি তোমার আছে। কাজেই সে-সব তৈরি করা হয়েছে। আমি কী বলছি বুঝতে পারছ ?'

'না, পারছি না।'

'ধীরে ধীরে বোঝাই ভালো। তোমার মস্তিষ্ক এখনো পুরোপুরি সবল হয় নি। আরো কিছু সময় যাক।'

'তোমরা কে ?'

'এখনো বুঝতে পারছ না ?'

'না।'

'বুঝবে, সময় হলেই বুঝবে।'

'আমার সঙ্গীরা কোথায় ?'

'সবাই ভালো আছে।'

'তিশ-২ নামের একটি রোবট ছিল—।'

'তাকেও ঠিকঠাক করা হয়েছে।'

'তোমরা কি বুদ্ধিমান কোনো প্রাণী ?'

'প্রাণী বলতে তোমরা যা বোঝ, আমরা সে-রকম নই। আমাদের জন্ম ও মৃত্যু নেই।'

'তা কী করে হয় !'

'কেন হবে না ? একটি আঙটির কথাই ধর। আঙটিটির কোনো শুরু নেই আবার শেষও নেই। তাই নয় কি ?'

'তোমরা দেখতে কেমন ?'

'এই প্রশ্নের জবাব আমরা জানি না। আমরা লক্ষ করেছি দেখার ব্যাপারটিতে তোমরা খুব জোর দিচ্ছ। এই ব্যাপারটা কী, সেই সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। এখন তুমি বিশ্রাম নাও।'

আমার চারদিকে অন্ধকার হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে পরিচিত ঘর অদৃশ্য। চারপাশে অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, কিংবা আমার চেতনা বিলুপ্ত হল। কী হল ঠিক জানি না।

৭

মানুষের বিস্মিত হবারও একটা সীমা আছে।

সীমা অতিক্রম করবার পর সে আর কোনো কিছুতেই বিস্মিত হয় না। আমার বেলায়ও তাই হয়েছে। বিস্মিত হবার ক্ষমতা অতিক্রম করেছি। চোখের সামনে যা দেখছি, তাতে আর অবাক হচ্ছি না। আমার জীবন এখন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে আছে—নিদ্রা এবং জাগরণ। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকছি, আবার জেগে উঠছি। জাগছি বিশেষ বিশেষ পরিবেশে। অকল্পনীয় সব দৃশ্য দেখছি, কিন্তু এখন আর অবাক হচ্ছি না।

এই মুহূর্তে আমার জাগরণের কাল চলছে। আমি এখন আছি একটা ছোট্ট কাঠের ঘরে। পুরনো ধরনের ঘর। পাহাড়ি অঞ্চলে অনেক আগের পৃথিবীর মানুষরা যে-রকম ঘর বানাত অবিকল সে-রকম লগ কেবিন। একটি জলন্ত ফায়ার-প্লেস আছে। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি ফায়ার-প্লেসে পুড়ছে। ঘরে পোড়া কাঠের ঝাঁঝাল গন্ধ। একটিমাত্র কাঁচের জানালা। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। বাইরের অঞ্চলটি কোনো পার্বত্য অঞ্চল নয়। সমভূমি। দিগন্তবিস্তৃত বরফ-ঢাকা মাঠ। আকাশ ধোঁয়াটে। প্রচুর তুষারপাত হচ্ছে। তুষারঝড় শুরু হবার আগের অবস্থা।

ফায়ার-প্লেসের সামনে একটি রকিং চেয়ারে বসে আছে ইনো। তার মুখ হাসি-হাসি। মনে হচ্ছে তার আনন্দের সীমা নেই। ইনো আমাকে দেখে চেয়ার দোলানো বন্ধ করে রহস্যময় গলায় বলল, 'পরিবেশটা কেমন লাগছে বলুন তো ? চমৎকার না ?'

আমি কিছু বললাম না। ইনো হালকা গলায় বলল, 'আপনি মনে হচ্ছে মোটেই অবাক হচ্ছেন না। আপনার কাছে সব কিছুই মনে হয় বেশ স্বাভাবিক লাগছে।'

কথার পিঠে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তবু বললাম, 'আপনি বেঁচে আছেন দেখে আনন্দ লাগছে। দুর্ঘটনার পর এই প্রথম সঙ্গীদের কোনো একজনের সঙ্গে দেখা হল।'

ইনো বলল, 'আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না আপনি আমাকে পেয়ে আনন্দে আটখানা হয়েছেন। কেমন কঠিন মুখ। বসুন আমার পাশে, গল্প করি। কে জানে এক্ষুণি হয়ত সব অদৃশ্য হয়ে যাবে।' বলতে বলতে সে শব্দ করে হাসল। আমি ইনোর পাশে বেতের নিচু চেয়ারটায় বসলাম। ফায়ার-প্লেসের আগুনের আঁচ এখন একটু বেশি। সরে বসলেই হয়, কিন্তু সরে বসতে ইচ্ছে করছে না। মাঝে মাঝে নিজেকে কষ্ট দিতেই বেশি ভালো লাগে। ইনো আবার দোল খেতে শুরু করেছে। মাথার দু'পাশ থেকে দু'টি লম্বা বেণি দুলছে। ইনোর মাথায় কখনো বেণি দেখি নি। সে এখানে চুল বেঁধে বেণি করেছে তাও মনে হয় না। তার গায়ের পোশাক, সাজসজ্জা—সবই অন্য কেউ করে দিচ্ছে। ইনো কি ব্যাপারটা লক্ষ করছে? তার ভাবভঙ্গি দেখে তা মনে হয় না। চোখ আধবোজা করে সে ক্রমাগত দোল খেয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থাতেই সে নরম গলায় বলল, 'খুব ছোটবেলায় আমি একটা বই পড়েছিলাম। বইটার নাম 'হলুদ আকাশ'। সেই বইয়ের নায়িকা একা-একা একটা বাড়িতে থাকত। ফায়ার-প্লেসের সামনে রকিং চেয়ারে বসে দোল খেত। আমি তখন থেকেই একটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করি।'

'কী স্বপ্ন?'

'যেন আমি 'হলুদ আকাশ' বইটির নায়িকা। নির্জন প্রান্তরের একটি লগ কেবিনে আমি আছি। ফায়ার-প্লেসে গনগনে আগুন। বাইরে তুষারঝড় হচ্ছে। প্রচণ্ড দুর্যোগ। ঝড়ের গর্জনে কান পাতা যাচ্ছে না। অথচ ঘরের ভেতর শান্তিময় একটা পরিবেশ। এখন যে রকম দেখছেন অবিকল সে রকম। এরা আমার স্বপ্নের কথা জানতে পেরে এরকম চমৎকার একটা পরিবেশ তৈরি করেছে।'

'এরা মানে কারা?'

'তা তো বলতে পারব না। যারা আমাদের বাঁচিয়ে তুলেছে, তারা। খুবই উন্নত কোনো প্রাণী। মহাশক্তিধর কেউ।'

'তাদের সঙ্গে কি আপনার কোনো কথা হয়েছে?'

'না। তবে তারা আমার মনের সব কথাই জানে এবং খুব ভালোভাবেই জানে, নয়তো এরকম চমৎকার পরিবেশ তৈরি করতে পারত না। আমি যা যা চেয়েছি সবই এখানে আছে।'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনার কল্পনায় যা যা ছিল সবই এখানে পেয়েছেন।'

'হ্যাঁ, পেয়েছি।'

'আপনি কি আমাকেও চেয়েছিলেন?'

'তার মানে ?'

'এই ঘর তৈরি হয়েছে আপনার কল্পনাকে ভিত্তি করে। যদি তাই হয়, তাহলে আমার উপস্থিতি ব্যাখ্যা করার উপায় কী ? উপায় একটিই ধরে নিতে হবে যে, আপনার কল্পনায় আমিও ছিলাম।'

ইনো চেয়ার দোলানো বন্ধ করে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর প্রায় বরফশীতল গলায় বলল, 'আমার কল্পনায় আপনি ছিলেন না। আমি একা একা এ রকম একটি ঘরে থাকার কথাই ভাবতাম। এটা আমার কিশোরী বয়সের কল্পনা। একজন কিশোরীর কল্পনার সঙ্গে হয়তো আপনার পরিচয় নেই। কিশোরীর কল্পনা সাধাণত নিঃসঙ্গ হয়। একজন কিশোরী কখনো কল্পনা করে না যে, সে একজন পুরুষের সঙ্গে একটি নির্জন ঘরে রাত্রিযাপন করছে।'

আমি লক্ষ করলাম ইনো বেশ রেগে গেছে। তার গলার স্বর কঠিন। মুখে রক্ত চলে এসেছে। এই মেয়ে মনে হচ্ছে খুব অল্পতেই অপমানিত বোধ করে। আমাদের এখন যে অবস্থা তাতে এত সহজে অপমানিত বোধ করার কথা নয়। আমি বললাম, 'আপনি আমার কথা ভাবেন নি, খুব ভালো কথা। রেগে যাচ্ছেন কেন ?'

ইনো আগের মত ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'শুরুতে আপনার কথা আমি ভাবি নি। কিন্তু পরে ভেবেছি। ভেবেছি বলেই এরা আপনাকে এখানে এনেছে।'

'কেন ভেবেছেন জানতে পারি ?'

'না, জানতে পারেন না।'

আমি হেসে ফেললাম। মেয়েটি কিশোরীদের মতো আচরণ করছে। অকারণে রাগছে। আমি বললাম, 'আপনি কি অনেক দিন ধরেই এখানে আছেন ?'

'হ্যাঁ, অনেক দিন। তবে ঘরটা সব সময় এক রকম থাকে না। একেক সময় একেক রকম হয়। এরা আমার কল্পনা নিয়ে খেলা করে। মূল ব্যাপারটা ঠিক রেখে একেক সময় একেক রকম করে পরিবেশ তৈরি করে। চমৎকার ব্যাপার !'

'আপনার মনে হয় বেশ মজা লাগছে।'

'লাগারই তো কথা। যেখানে মরতে বসেছিলাম, সেখানে দিব্যি বেঁচে আছি। যারা আমাদের বাঁচিয়েছে, তাদের খুব খারাপ প্রাণী বলেও আমার কাছে মনে হচ্ছে না। আমাদের মোটামুটি সুখেই রেখেছে। আশা করা যাচ্ছে ভবিষ্যতেও রাখবে।'

ইনো বেশ শব্দ করে হাসল। তার সঙ্গে এর আগে একবার মাত্র আমার কথা হয়েছে। অল্প কিছু সময় কথা বলে একজন সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। মানুষ অত্যন্ত রহস্যময় প্রাণী, তাকে বুঝতে হলে দীর্ঘদিন তার পাশাপাশি থাকতে হয়। ইনোর পাশাপাশি থাকার মতো সুযোগ আমার হয় নি। তবু আমার মনে হল এই ইনো ঠিক আগেকার ইনো নয়। সূক্ষ্ম কিছু পরিবর্তন তার মধ্যে হয়েছে, যা আমি ধরতে পারছি না। তারা নানান রকম পরিবেশ তৈরি করেছে। পরিবেশ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছে। যদি তাই হয় তাহলে মানুষ নিয়েও কি পরীক্ষানিরীক্ষা

করছে না ? হয়তো একেক বার একেক ধরনের ইনো তৈরি করছে। নষ্ট করে ফেলছে, আবার তৈরি করছে।

আমি হালকা গলায় বললাম, 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এরা আমাদের তৈরি করেছে। আপনি নিজে একজন জীববিজ্ঞানী। জীববিজ্ঞানী হিসেবে আপনি বলুন, তৈরি করার কাজটিতে তারা কেমন সফল ?'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'আপনাকে এরা নতুন করে তৈরি করেছে। কারণ ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর আপনি এবং আমরা সবাই ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম। তাই নয় কি ?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'যদি তাই হয়ে থাকে, তবে আমাদের আবার তৈরি করার মতো জটিল কাজটি এরা চমৎকার ভাবে করেছে। তবু আমার মনে হচ্ছে আমরা ঠিক আগের মতো নই। আপনার কি তা মনে হয় না ?'

ইনো হেসে ফেলে বলল, 'আগে হচ্ছিল না, এখন হচ্ছে। আপনার বকবকানি শুনে মনে হচ্ছে। আপনার এ রকম বকবকানি স্বভাব আগে ছিল না।'

ইনো খিলখিল করে হেসে উঠল। সেই হাসি আর থামতেই চায় না। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে গেল। সেই পানি সে মুছল না। চমৎকার ছবি। মুগ্ধ হয়ে থাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। ইনো বলল, 'এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন ?'

আমি বললাম, 'আপনাকে কি একটা প্রশ্ন করতে পারি ?'

'অবশ্যই পারেন। তবে প্রশ্নের উত্তর দেব কি দেব না তা আমার ইচ্ছা। কী প্রশ্ন ?'

'কিশোরী বয়সে আপনি একটি উপন্যাস পড়েছিলেন। যে উপন্যাসের নায়িকা এ রকম একটা লগ কেবিনে একা-একা থাকত, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'সেও কি মাঝে-মাঝে খুব হাসত ? হাসতে-হাসতে তার চোখে পানি এসে যেত কি ?'

'হ্যাঁ। কেন জিজ্ঞেস করছেন ?'

'আপনিও অবিকল সে রকম করেছেন। আপনার মানসিকতা ঐ মেয়েটির মতো হয়ে গেছে। অর্থাৎ এরা আপনাকে বদলে ফেলেছে।'

'তাতে অসুবিধা কী ?'

'কোনো অসুবিধা নেই। তবে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, এরা আমাদের নিয়ে খেলছে। একজন শিশুকে খানিকটা কাদা দিলে শিশুটি কী করে ? একেক সময় একেক রকম খেলনা বানায়। কোনোটাই তার পছন্দ হয় না। ভাঙে এবং তৈরি করে।'

'এরা শিশু

'না, তা নিশ্চয়ই নয়। এরা অতি উন্নত কোনো প্রাণী। তবে উন্নত প্রাণীর মধ্যে শিশুসুলভ কিছু থাকে।'

'তাতে অসুবিধা কী? আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমরা যে বেঁচে আছি আমি তা সম্ভব হয়েছে এদের জন্যেই।'

'সত্যিই কি আমরা বেঁচে আছি?'

'তার মানে?'

'আপনি একজন জীববিজ্ঞানী, আমরা বেঁচে আছি কিনা তা একমাত্র আপনার পক্ষেই বলা সম্ভব। বেঁচে থাকার একটি শর্ত হচ্ছে খাদ্য গ্রহণ। আপনি কখনো খাদ্য গ্রহণ করেছেন বলে কি আপনার মনে পড়ে?'

ইনো জবাব দিল না। তার ভ্রূ কুঞ্চিত হল। আমি বললাম, 'আমার তো মনে হয় চারপাশে যা দেখছি সবই মায়া, এক ধরনের বিভ্রম।'

'এ রকম মনে হবার কারণ কী?'

'আপনি রকিং-চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছেন, তাই না? আপনার গায়ে কী পোশাক?'

'বিশেষ কোনো পোশাক নয়। সাধারণ স্কার্ট।'

'কিন্তু আমি আপনার গায়ে কিছু দেখছি না। আমি দেখছি অত্যন্ত রূপবতী একজন তরুণী নগ্ন গায়ে রকিং-চেয়ারে দোল খাচ্ছে।'

ইনো হকচকিয়ে গেল। আমি বললাম, 'এরা এইসব ছবি আমাদের মস্তিষ্কে তৈরি করছে। আমার তো মনে হয় আমরা দু' জন পাশাপাশিও নেই। হয়ত ওদের ল্যাবোরেটরির এক কোনায় আপনার মস্তিষ্ক পড়ে আছে। অন্য প্রান্তে আমারটা। ওরা আমাদের মস্তিষ্কের নিওরোন নিয়ে খেলা করছে।'

ইনো চাপা গলায় বলল, 'আপনি কি সত্যি সত্যি আমার গায়ে কোনো কাপড় দেখতে পাচ্ছেন না?'

'না।'

'আমার তো মনে হয় আপনি সত্যি কথা বলছেন না। আমাকে ধাঁধায় ফেলে দেবার জন্যে বানিয়ে বানিয়ে বলছেন।'

'আমি যে সত্যি কথা বলছি তা এক্ষুণি প্রমাণ করতে পারি।'

'প্রমাণ করুন।'

'আপনার শরীরের একজায়গায় লালরঙের এক বর্গ সেন্টিমিটার আয়তনের একটা জন্মদাগ আছে। জায়গাটা হচ্ছে...।'

'থাক আর বলতে হবে না। প্লিজ আপনি এখন আর আমার দিকে তাকাবেন না। অন্য দিকে তাকিয়ে থাকুন।'

'আপনার দিকে তাকালেও কোনো ক্ষতি নেই। কারণ আমরা যা দেখছি সবই মায়া—বিভ্রম। কোনোটাই সত্যি নয়।'

'সত্যি হোক আর না হোক, আপনি আমার দিকে তাকাবেন না।'

আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। ফায়ার-প্লেসের আগুন নিভে আসছে। কাঠের বড় বড় গুঁড়ি পুড়ে শেষ হয়েছে। শীত শীত লাগছে। বাইরে তুষারঝড়ের মাতামাতি। দমকা হাওয়ায় জানালা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ইনোর রকিং-চেয়ার থেকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। অর্থাৎ তার দুলুনি বন্ধ হয়েছে। ঘরের আলো কমে আসতে শুরু করেছে। এটা কি শুধু আমার জন্যেই, নাকি ইনোর কাছেও এ রকম মনে হচ্ছে ? আমি ডাকলাম, 'ইনো।'

'বলুন শুনছি।'

'আমি দেখছি ঘরের আলো কমে আসছে। আপনার কাছেও কি সে-রকম মনে হচ্ছে ?'

'না।'

'আপনার কাছে কি আলো ঠিকই আছে ?'

'হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে।'

'তার মানে এরা আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। এখন হয়তো আমার বদলে অন্য কেউ আসবে।'

'হয়তো-বা।'

'এতদিন মানুষ হিসেবে আপনারা অসংখ্য পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। এখন ওরা আমাদের নিয়ে পরীক্ষা করছে। আমরা ওদের কাছে মূল্যহীন গিনিপিগ ছাড়া আর কিছু নই।'

'মূল্যহীন বলছেন কেন ? উল্টোটাও তো হতে পারে। হয়তো আমরা খুবই মূল্যবান।'

'মূল্যবান হলে ওরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করত। তা কিন্তু করছে না। ওরা ওদের মতো কাজকর্ম করে যাচ্ছে। তাই নয় কি ?'

'হ্যাঁ।'

'ইনো।'

'বলুন শুনছি, কিন্তু দয়া করে আমার দিকে তাকাবেন না।'

'আপনি কি লক্ষ করেছেন যে এরা শুধু সুখের স্মৃতিগুলি নিয়ে খেলা করছে ? আপনার জীবনের অনেক দুঃখময় ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। সে-সব নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। ওরা ইচ্ছা করলে ভয়ংকর সব পরিবেশ তৈরি করতে পারত। পারত না ?'

'হ্যাঁ, পারত।'

'তা কিন্তু ওরা করে নি।'

ইনো ক্লান্ত গলায় বলল, 'এখনো করে নি। ভবিষ্যতে হয়তো করবে।' ইনোর কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘর পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল। তন্দ্রা বা ঘুমের মতো কোনো একটা জগতে আমি চলে গেলাম, যে জগৎ সম্পর্কে আমার সামান্যতম ধারণাও নেই।

৮

আমার দিন কাটছে।

কেমন কাটছে ?

বলা মুশকিল। ইনোর সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি, আমি সময় কাটাচ্ছি আমার নিজের ঘরে। কখনো বিছানায় শুয়ে থাকি, কখনো উঠে বসি, কখনো হাঁটাহাঁটি করি। কুৎসিত জীবন। মাঝে-মাঝে অসহ্য বোধ হয়, ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে বলি, দয়া করে আপনারা আমাকে মুক্তি দিন। আমি মানুষ। এ জাতীয় বন্দি জীবনে আমি অভ্যস্ত নই। ঠিক তখনি ঘরের আলো কমে আসে, আমি ঘুমিয়ে পড়ি কিংবা চেতনা বিলুপ্ত হয়, কিংবা অন্য কোনো জগতে চলে যাই। আবার একই ঘরে এক সময় জেগে উঠি, শুরু হয় পুরনো রুটিন।

কখনো কখনো মনে হয় ঘুম এবং জাগরণের এই চক্র চলছে দীর্ঘ সময় ধরে। বছরের পর বছর পার হয়ে যাচ্ছে। আবার পরক্ষণেই মনে হয়—না, দীর্ঘ সময় তো নয়, অল্প কিছুদিন মাত্র পার হল।

কতদিন পার হল তা টের পাওয়া খুব কঠিন কিছু নয়। সময়ের সঙ্গে হাত ও পায়ের নখ বড় হয়। চুল লম্বা হয়। চুল কতটুকু বড় হল, বা নখ কতটুক বড় হল, সেখান থেকে অতি সহজেই সময়ের হিসাব করা যায়। আমি তা করতে পারছি না। কারণ আমার নখ বড়ো হচ্ছে না বা চুলও বাড়ছে না। এটা মোটামুটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ, যা আমার প্রথম দিকের সন্দেহকে দৃঢ় করে। শুরু থেকেই আমি ভাবছিলাম, আমার শরীর বলে কিছু নেই। চারপাশে যা ঘটছে তার সবটাই কল্পনা। তবে এই তথ্যেও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কারণ আমার ক্ষুধা বা তৃষ্ণার বোধ না থাকলেও শীতবোধ আছে যা থাকার কথা নয়। নাড়ি ধরলে টিক টিক শব্দ পাওয়া যায়, যার মানে শরীরে রক্তপ্রবাহ চলছে। তাই-বা কী করে হয় ! ব্যাপারটা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায় কীভাবে ? এটা নিয়ে প্রায়ই ভাবি। কোনো কূল-কিনারা পাই না।

একদিন বিদ্যুৎ চমকের মতো মাথায় একটা বুদ্ধি এল। একটা আলপিন বুড়ো আঙুলে ঢুকিয়ে দিলেই তো হয়। দেখা যাক রক্ত বেরোয় কিনা। দিলাম আলপিন ফুটিয়ে। ব্যথা পেলাম, রক্ত বেরুল। আর তখনি দ্বিতীয় পরিকল্পনাটা মাথায় এল—শরীরে কোনো একটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করলে কেমন হয় ? টেবিলের উপর একটা কাঁচি আছে। কাগজ-কাটা কাঁচি। অতি সহজেই সেই কাঁচি ব্যবহার করা যেতে পারে। চোখ বন্ধ করে কাঁচির একটা মাথা পায়ের উরুতে বসিয়ে হ্যাঁচকা টান দেয়া। কঠিন কোনো কাজ নয়, তবে অবশ্যই মনের জোর লাগবে। আমি দেখতে চাই ক্ষত সৃষ্টি হবার পরপর এরা কী করে। আমার শরীর বলে যদি সত্যি সত্যি কিছু থেকে থাকে, তবে এদের তৎক্ষণাৎ এগিয়ে আসতে হবে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগেরও একটা সুযোগ হতে পারে।

আমি টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। কাঁচি পাওয়া গেল না। যদিও অল্প কিছুক্ষণ আগেও কাঁচিটা ছিল। কিন্তু এখন নেই। কোথাও নেই। পুরোপুরি বাতাসে মিলিয়ে গেছে। আমি ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেললাম। এরা আমাকে লক্ষ করছে। তবে এত উল্লসিত হবার কিছু নেই। মানুষ যখন গিনিপিগ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করে, তখন সে গিনিপিগদের দিকে লক্ষ রাখে। খেয়াল রাখে যাতে এই গিনিপিগরা নিজেদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে। এরাও তাই করছে। এর বেশি কিছু নয়।

আমি বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। চোখ বন্ধ করে কোনো একটা সুখের কল্পনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু তেমন কোনো সুখের কল্পনা মাথায় আসছে না। এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করতে শুরু করেছি। এই রকম অবস্থায় ব্যাপারটা ঘটল। ওদের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ হল। আগেও অবচেতন অবস্থায় ওদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয়েছে, আজকেরটা সে-রকম নয়। এর মধ্যে কোনো রকম অস্পষ্টতা নেই। যোগাযোগের মাধ্যম টেলিপ্যাথিক। কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছি না, কিন্তু ওরা কী বলছে, তা বুঝতে পারছি। আমি কী বলছি, তাও ওরা বুঝতে পারছে।

কীভাবে কথাবার্তা শুরু হল, তার একটা বর্ণনা দিতে চেষ্টা করি : বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করা মাত্র মাথার বাঁ পাশে মুহূর্তের জন্যে তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণা হল। বমি ভাব হল, তা স্থায়ী হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথা হালকা বোধ হতে লাগল। দীর্ঘদিন রোগে ভোগার পর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে যে-রকম লাগে সে-রকম। তার পরপরই শুনলাম কিংবা মনে হল কেউ একজন জিজ্ঞেস করছে, 'তুমি কেমন বোধ করছ ?' এই প্রশ্ন বিশেষ কোনো ভাষায় করা হল না। কিন্তু পরিষ্কার বুঝলাম ওরা জানতে চাচ্ছে আমি কেমন বোধ করছি। অবিশ্বাস্য ব্যাপার ! শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ হল। আমি বললাম, 'ভালোই বোধ করছি।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। আবার প্রশ্ন হল। প্রশ্নের মধ্যে কোথায় যেন কিছুটা প্রশ্রয় এবং কৌতুক মেশানো।

'তোমরা এত সহজে এত অস্থির হও কেন ?'

'আমার অবস্থাটা সহজ মনে করছেন কেন ? অনিশ্চয়তা একটা ভয়াবহ ব্যাপার।'

'তোমরা বড় হয়েছ অনিশ্চয়তায়, তোমাদের জীবন কেটেছে অনিশ্চয়তায়—তারপরেও অনিশ্চয়তাকে ভয় ?'

'আপনারা কারা ?'

'তোমার এই প্রশ্নের উত্তর আগে একবার দিয়েছি। আবারো দিচ্ছি—আমরা পরিব্রাজক।'

'বুঝতে পারলাম না।'

'আমাদের অনেক কিছুই বুঝতে পারবে না। বুঝতে চেষ্টা করে জটিলতা বাড়াবে। তা কি ভালো হবে ?'

'বুঝতে পারব না কেন ?'

'তোমরা তোমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে কল্পনা করতে পার না। তোমরা যখন একটি দৈত্যের ছবি আঁক, সেও দেখতে মানুষের মতো হয়। তোমাদের কল্পনা সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ কল্পনায় আমাদের বোঝা মুশকিল।'

'তবু চেষ্টা করব। পরিব্রাজক ব্যাপারটা কী ?'

'যিনি ঘুরে বেড়ান, তিনিই পরিব্রাজক। আমরা ঘুরে বেড়াই। একদিন যাত্রা শুরু করেছিলাম, এখনো চলছি। চলতেই থাকব।'

'কোথায় ?'

'জানি না।'

'যাত্রা শুরু হয়েছিল কবে ?'

'তাও জানি না।'

'আপনি কি একা, না আপনারা অনেকে ?'

'আমরা একই সঙ্গে একা এবং একই সঙ্গে অনেকে।'

'বুঝতে পারছি না।'

'আগেই তো বলেছি বুঝতে পারবে না।'

'আপনার কি জন্ম-মৃত্যু আছে ?'

'মৃত্যু বলে তো কিছু নেই। পদার্থবিদ্যায় পড় নি, শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই ?'

'আপনি কি এক ধরনের শক্তি ?'

'শুধু আমি কেন, তুমি নিজেও তো শক্তি।'

'আপনি বলছেন আপনি ভ্রমণ করেন। এতে কী লাভ হয় ?'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না। লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন আসছে কেন ?'

'সব কিছুরই কোনো-না-কোনো উদ্দেশ্য থাকে। আপনার ভ্রমণের উদ্দেশ্য কী ?'

'জ্ঞানলাভ। আমি শিখছি।'

'কেন শিখছেন ?'

'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানবার জন্যে।'

'এই জ্ঞান দিয়ে কী করবেন ?'

'তুমি অদ্ভুত সব প্রশ্ন করছ।'

'এই জাতীয় প্রশ্ন কি আপনি নিজেকে কখনো করেন না ?'

'না। আমি দেখি। কত অপূর্ব সব রহস্য এই অনন্ত নক্ষত্রবীথিতে। বড়ো ভালো লাগে। এই যে তোমাদের দেখা পেয়েছি, কী বিপুল রহস্য তোমাদের মধ্যে !'

'কী রহস্য ?'

'এখনো পুরোপুরি ধরতে পারি নি। আরো কিছু সময় লাগবে।'

'শেষ পর্যন্ত আমাদের দিয়ে কী করবেন ?'

'তোমরা যা চাও তা-ই করব। কী চাও তোমরা ?'

'যা চাই তা-ই করতে পারবেন ?'

'কেন পারব না?'

'পৃথিবীতে ফেরত পাঠাতে পারবেন?'

'সে তো খুবই সহজ ব্যাপার।'

'আপনি সত্যি বলছেন?'

'তাই তো মনে হয়। তুমি কি পৃথিবীতে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'একজন তরুণী তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে, সেই কারণে?'

'হ্যাঁ।'

'অবিকল ঐ তরুণীটিকে যদি তৈরি করে দিই, তাহলে কেমন হয়?'

'কীভাবে তৈরি করবেন?'

'একটি সম্পূর্ণ মানুষ তৈরি করতে প্রয়োজন হয় একটি ডিএনএ এবং একটি আরএনএ অণু। তোমার ভালোবাসার মেয়েটির একগুচ্ছ চুল তোমার সঙ্গে ছিল। সেখান থেকেই তৈরি করে দেয়া যায়।'

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। কী অদ্ভুত সব কথা! এসব কি সত্যি সত্যি শুনছি না ঘোরের মধ্যে কল্পনা করে নিচ্ছি? আবার কথা শোনা গেল, 'অবিকল তোমাদের সূর্যের মতো একটা নক্ষত্র আশেপাশে আছে। তার কাছাকাছি তোমাদের পৃথিবীর মতো একটি গ্রহও আছে। সেখানে তোমরা নতুন জীবন শুরু করতে পার।'

'নতুন জীবন শুরু করবার আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমি আমার পুরনো জায়গায় ফিরে যেতে চাই।'

'তোমার বান্ধবীর কাছে?'

'হ্যাঁ, তা-ই।'

আমার মনে হল আমি হাসির শব্দ শুনলাম। কিংবা হাসির কাছাকাছি কোনো প্রক্রিয়া ঘটল। ওরা যেন খুব মজা পাচ্ছে।

'তুমি অন্যদের মতো নও। তোমার সঙ্গীরা কেউ পুরনো জায়গায় ফিরে যেতে চাচ্ছে না।'

'সেটা তাদের ইচ্ছা। আমি যা চাই তা বললাম।'

'ওরা কী চায় তা জানতে চাও?'

'না। ওদের প্রসঙ্গে আমার কোনো কৌতূহল নেই।'

'কৌতূহল না থাকার কারণ কী?'

'এমনিতেই আমার কৌতূহল কম।'

'তুমি ঠিক বলছ না। তোমার কৌতূহল যথেষ্ট আছে। আমাদের সম্পর্কে তুমি একগাদা প্রশ্ন করেছ।'

'শুধু আমি একা নিশ্চয়ই না, আমার সঙ্গীরাও নিশ্চয়ই আপনাদের একগাদা প্রশ্ন করেছে।'

'না, করে নি। তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সম্ভব হয় নি।'

'কেন হয় নি?'

'তা বুঝতে পারছি না। তোমরা যাকে ইএসপি ক্ষমতা বল, সেই ক্ষমতা তোমার যেমন আছে তোমার সঙ্গীদেরও তেমনি আছে। কিন্তু তারা তা ব্যবহার করতে পারছে না, অথচ তুমি পারছ। এই রহস্য আমরা ভেদ করতে পারছি না।'

'আমাদের আর কোন্ কোন্ রহস্য আপনারা ভেদ করতে পারেন নি?'

'অনেক কিছুই পারি নি।'

'অনেক কিছু না পেরেও অবিকল আমাদের মতো প্রাণ সৃষ্টি করে ফেললেন!'

'জীন থেকে প্রাণ সৃষ্টি তেমন জটিল কিছু নয়। ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার সহজ প্রয়োগ।'

'আমাদের কোন্ ব্যাপারটি আপনারা বুঝতে পারছেন না, বলুন। আমি আপনাদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করব। তবে তার বদলে আপনারা আমাকে পৃথিবীতে ফেরত পাঠাবেন।'

আবার হাসির মতো শব্দ হল। ভুল বললাম, শব্দ নয়, আমার কেন জানি ধারণা হল ওরা হাসছে। খুব মজা পাচ্ছে। শিশুদের ছেলেমানুষি অথচ ভারিক্কি ধরনের কথায় আমরা যেমন মজা পাই।

'ভয় নেই, আমরা তোমাকে পৃথিবীতে ফেরত পাঠাব।'

'আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'আবার সেই সঙ্গে এখানেও রেখে দেব।'

'তা কী করে সম্ভব?'

'খুব কি অসম্ভব?'

'পদার্থবিদ্যার একটি সূত্র হচ্ছে একটি বস্তু একই সঙ্গে দু'টি স্থান দখল করতে পারে না।'

'পদার্থবিদ্যার সূত্র বহাল রেখেও তা করা যাবে। যখন করব তখন বুঝবে। তবে এই সঙ্গে তোমাকে বলে রাখি, তোমাদের পদার্থবিদ্যার অনেক সূত্রই কিন্তু সত্যি নয়।'

'তাতে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি পদার্থবিদ নই। পদার্থবিদ্যার সমস্ত সূত্র রসাতলে যাক, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না।'

'তুমি তোমার বান্ধবীর কাছে ফিরে যেতে পারলেই খুশি?'

'হ্যাঁ, তা-ই।'

'সে কি একজন অসাধারণ মহিলা।'

'হ্যাঁ অসাধারণ।'

'আমাদের কাছে তাকে কিন্তু খুব অসাধারণ কিছু মনে হল না।'

'তার মানে!'

'আমরা তোমার বান্ধবীকে তৈরি করেছি।'

আমি চুপ করে রইলাম। না, আর অবাক হব না। কোনো কিছুতেই না।

'তোমার বান্ধবী সমস্ত ব্যাপারটাকে স্বপ্ন বলে ধরে নিয়েছে। আমরা তাকে তোমার কাছে পৌঁছে দেব। তুমি ধীরেসুস্থে তাকে সব বুঝিয়ে বল।'

'তোমরা যে-নিকি তৈরি করেছ, সে পৃথিবীর নিকি নয়।'

'সে অবিকল পৃথিবীরই নিকি, তবে তাকে তৈরি করা হয়েছে।'

'তার মানে, এই মুহূর্তে দু' জন নিকি আছে ?'

'হ্যাঁ, দু' জন আছে। প্রয়োজনে আরো অনেক বাড়ানো যেতে পারে। কাজেই এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে একই বস্তু একই সঙ্গে দু'টি স্থান দখল করতে পারে।'

'হ্যাঁ, পারে।'

'তুমি কি তোমার বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আগ্রহ্‌ বোধ করছ না ?'

'না, করছি না। কারণ সে নিকি নয়, রোবট শ্রেণীর কেউ।'

'খুব ভুল বললে।'

'আমি ভুল বলি নি।'

'বিশ্রাম নাও, তুমি ক্লান্ত। বিশ্রামের পর যখন জেগে উঠবে, তোমার বান্ধবী থাকবে তোমার পাশে।'

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

৯

'তোমার কফিতে ক্রিম দেব ?'

আমি চমকে ফিরে তাকালাম। নিকি দাঁড়িয়ে আছে। সেই পরিচিত নিকি। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। রান্নাঘরে কাজকর্ম করার সময় যে এপ্রন সে গায়ে দেয়, সেই নীল রঙের এপ্রন গায়ে দিয়েছে। হাতে কফির মগ। আমি বললাম, 'দাও, খানিকটা ক্রিম দাও।'

নিকি রান্নাঘরে ফিরে যাচ্ছে। পা কেমন যেন ক্লান্ত ভঙ্গিতে ফেলছে। বিজবিজ শব্দ হচ্ছে কফি-মেকারে। টাটকা কফির সুঘ্রাণ ঘরময় ভেসে বেড়াচ্ছে। চমৎকার দৃশ্য। অভিভূত করে দেবার মতো। আমি অবশ্যি অভিভূত হলাম না। এই নিকির প্রতি আমি পুরনো আকর্ষণ বোধ করছি না। সেই তীব্র তীক্ষ্ণ আনন্দ আমার মধ্যে নেই। নিকিকে মনে হচ্ছে পুতুলের মতো, যদিও জানি সে পুতুল নয়।

'আধ চামচ চিনি দিয়েছি।'

'ভালো করেছ।'

নিকি আমার পাশে এসে বসল। নিজের মনেই বলল, 'এটা বোধ হয় স্বপ্ন, তাই না ? তোমার সঙ্গে তো আমার দেখা হবার কোনো কারণ নেই।'

আমি উত্তর না দিয়ে কফির কাপে চুমুক দিতে লাগলাম। সমস্ত ব্যাপারটা নিকিকে গুছিয়ে বলতে হবে। বলার পরেও সে বুঝতে পারবে কিনা কে জানে।

'নিকি তুমি কফি খাচ্ছ না ?'

'ইচ্ছা করছে না। স্বপ্নের মধ্যে আমার কিছু খেতে ইচ্ছা করে না, ভালোও লাগে না। তোমার পাশে বসে থাকতে ভালো লাগছে।'

নিকি খুব স্বাভাবিকভাবে তার বাঁ হাত আমার কোলে রাখল। মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খানিকটা বিষণ্ণও হয়ে পড়ল। আমি বললাম, 'তুমি যা দেখছ, তার কিছুই কিন্তু স্বপ্ন নয়। এবং এটা যে স্বপ্ন নয়, তা আমি চট করে প্রমাণ করতে পারি।'

'প্রমাণ কর।'

'তার জন্যে তোমাকে এক চুমুক কফি খেতে হবে। নাও আমার মগ থেকে খাও।'

নিকি কফির মগে ছোট্ট একটা চুমুক দিল। আমি বললাম, 'কফিটা কেমন লাগছে ?'

'ভালো।

'মিষ্টি ছিল না ?'

'কিছুটা।'

'স্বপ্নদৃশ্যে আমরা অনেক ধরনের খাবার-দাবার খাই। তার কোনোটারই কিন্তু কোনো স্বাদ নেই।'

'কে বলল তোমাকে ?'

'আমি জানি।'

'তুমি মাস্টারদের মতো কথা বলছ। এভাবে কথা তুমি বল না। এখন বলছ, কাজেই এটা স্বপ্ন। স্বপ্ন না হলে তোমার দেখা পাব কী করে ?'

'নিকি, এটা স্বপ্ন নয়।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, যাও এটা স্বপ্ন না। কিছু সময়ের জন্যে তোমাকে পাওয়া গেছে, আর তুমি শুরু করেছ তর্ক !'

'এটা যে স্বপ্ন না, এও তার একটা বড় প্রমাণ। স্বপ্নে কথা বলাবলির ব্যাপারটা কম থাকে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে বাবা, চুপ কর।'

আমি চুপ করলাম। নিকি হালকা গলায় বলল, 'কফি শেষ হয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে কফির মগ রান্নাঘরে রেখে এসে আমাকে একটু আদর কর।'

আমি হেসে ফেললাম। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম পুরনো আবেগ, পুরনো ভালোবাসা ফিরে আসতে শুরু করেছে। নিকিকে এখন আর পুতুল বলে মনে হচ্ছে না। কী সুন্দরই না তাকে লাগছে ! পৃথিবীর জীবনে তাকে কি এত সুন্দর লাগত ?

নিশ্চয়ই লাগত হয়তো। তখন এত ভালো করে লক্ষ করি নি। কিংবা কে জানে এরা হয়তো তাকে আরো সুন্দর করে বানিয়েছে।

নিকিকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। সে বুঝতে পারল কিনা জানি না, তবে চুপ করে বসে রইল। প্রতিবাদ করল না। প্রতিবাদ করলে ভালো হত, আমি আমার যুক্তিগুলি আরো গুছিয়ে তাকে বলতে পারতাম।

'নিকি।'

'বল।'

'আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছ?'

'জানি না। বিশ্বাস করি বা না-করি তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি পাশে আছ, এই যথেষ্ট।'

'তুমি মনে হচ্ছে বেশ সুখী।'

'হ্যাঁ সুখী। কেন সুখী হব না বল? একজন মানুষের সুখী হতে খুব বেশি কিছু কি লাগে?'

'না, তা অবশ্যি লাগে না।'

নিকি ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার মাস্টারি ধরনের কথা শুনে কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। অন্য কিছু বল।'

'কী ধরনের কথা বলব?'

'ভালোবাসার কথা বল। তুমি যে আমাকে ভালোবাস এই কথাটা বল।'

'এটা তো তুমি জানই। নতুন করে বলার প্রয়োজন কি?'

'প্রয়োজন আছে।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'আবার বল।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'থামবে না, বলতেই থাক।'

নিকির চোখে জল টলমল করছে। আমি মৃদুস্বরে বারবার বলছি, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি', আর সে চোখ মুছছে। আমার নিজের চোখও ভিজে উঠতে শুরু করেছে। অশ্রু খুবই সংক্রামক ব্যাপার। নিকি বলল, 'আর কখনো তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না।'

আমি কিছু বললাম না, একটা হাত রাখলাম তা হাতে। স্পর্শ দিয়েও অনেক কিছুই বলা যায়। আমি নিকিকে কাছে টানলাম—ঠিক তখন 'ওদের' সঙ্গে যোগাযোগ হল। ওরা স্পষ্ট স্বরে বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আমি চাই না।'

'আমরা অত্যন্ত কৌতূহল বোধ করছি। দয়া করে আমাদের প্রশ্নের জবাব দাও।'

'আমি কোনো কৌতূহল বোধ করছি না। আমাকে আমার বান্ধবীর সঙ্গে থাকতে দিন।'

'তোমার বান্ধবী দীর্ঘকাল তোমার পাশে থাকবে, আমরা থাকব না। আমরা পরিব্রাজক। আমরা বেশি সময় একজায়গায় থাকতে পারি না। আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে।'

'কখন যাত্রা শুরু হবে?'

'খুব শিগগিরই।'

'আমাদের কী হবে?'

'তোমাদের জন্যে কোনো একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে।'

'সে ব্যবস্থাটা কী, জানতে চাই।'

'সময় হলেই জানবে, এখনো সময় হয় নি। এখন দয়া করে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

'আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে আমি আপনাদের কোনো প্রশ্নের জবাব দেব না।'

'তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন?'

'আমি রেগে যাচ্ছি না। আমি শুধু বলছি, আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে আমি আপনাদের কোনো প্রশ্নের জবাব দেব না।'

'ঠিক আছে জবাব দিও না।'

কথাবার্তা থেমে গেল। মাথায় ভোঁতা ধরনের যন্ত্রণা নিয়ে আমি তাকালাম নিকির দিকে। নিকি বলল, 'কী হয়েছে?'

'ওরা কথা বলছিল। ওরা মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কথা বলে। যত বারই কথা বলি, তত বারই রেগে যাই।'

'ওরা কি আজেবাজে কিছু বলে?'

'না, আজেবাজে কিছুই বলে না। তবু প্রচণ্ড রাগ লাগে। কেন তাও জানি না।'

'রেগে যাওয়ার স্বভাব কিন্তু তোমার ছিল না। তুমি মনে হয় খানিকটা বদলে গেছ।'

'খানিকটা না, অনেকখানি বদলেছি। ওরা বদলে দিয়েছে।'

'থাক ওদের কথা, যা হবার হবে। অন্য কিছু বল।'

'অন্য কিছু বলব? বলার তো আর কিছু নেই।'

রান্নাঘরে খুটখুট শব্দ হচ্ছে। কফি পার্কোলেটরে শব্দ হচ্ছিল, কে যেন সেটা বন্ধ করল। কাপ ধোয়ার মতো শব্দ হচ্ছে। চামচ নড়ছে। কেউ একজন কফি বানাচ্ছে রান্নাঘরে। আমি এবং নিকি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। তৃতীয় ব্যক্তি কে হতে পারে? কে কফি বানাতে বসেছে? নিকি উঠে গেল, রান্নাঘরে ঢুকল না। দরজা পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়াল। আমি দেখলাম সে মূর্তির মতো জমে গেছে। যেন তার নিশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। মুখে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। আমি বললাম, 'কী হয়েছে নিকি?'

সে জবাব দিল না। নিঃশব্দে ফিরে এসে কপালের ঘাম মুছল। বসল আমার পাশে। আমি লক্ষ করলাম সে থরথর করে কাঁপছে।

'কী হয়েছে নিকি ?'

'বুঝতে পারছি না।'

'কী দেখলে ?'

নিকি জবাব দিল না। বড়ো বড়ো করে নিশ্বাস ফেলতে লাগল। তার মুখ রক্তশূন্য। আমি আবার বললাম, 'রান্নাঘরে কে ?'

'তুমি যাও। তুমি দেখে এস। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি খুব সম্ভব পাগল হয়ে গেছি। আমার মাথা ঠিক নেই। সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। এগিয়ে গেলাম দরজা পর্যন্ত। হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি। নিকির বিস্ময় ও হতাশার কারণ বুঝতে পারছি। রান্নাঘরে আমি নিজেই আছি। দ্বিতীয় আমি। ওরা আরেকজন আমাকে তৈরি করেছে। নিজের সঙ্গে নিজের দেখা হওয়ার ঘটনাটা কেমন ? খুবই আনন্দের কোনো ব্যাপার কি ? না, আনন্দের কোনো ব্যাপার নয়। আমি তীব্র ঘৃণা নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। সেও তাকাল আমার দিকে। তার মুখে হাসি। কিন্তু বুঝতে পারছি, তার চোখেও তীব্র ঘৃণা। আমি কর্কশ গলায় বললাম, 'তুমি কে ?'

সে কফির মগ নামিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তুমি ভালো করেই জান আমি কে। অর্থহীন কথাবার্তা বলার প্রয়োজন দেখি না। ওরা তোমার দ্বিতীয় কপিটি তৈরি করেছে।'

'নকল কপি ?'

'আসল-নকলের কোনো ব্যাপার নয়। ওরা যে-'জীন' থেকে তোমাকে তৈরি করেছে, সেই একই জীন থেকে আমাকেও তৈরি করেছে। আসল হলে দু'টোই আসল, নকল হলে দুটোই নকল।'

'ওরা কপি তৈরি করল কেন ?'

'আমাকে এই প্রশ্ন করা কি অর্থহীন নয় ? তোমার মনে যে প্রশ্ন আসছে, আমার মনেও সেই একই প্রশ্ন আসছে। শারীরিক এবং মানসিক—এই দুই দিক দিয়েই তোমার সঙ্গে আমার কোনো প্রভেদ নেই। এই মুহূর্তে তুমি কী ভাবছ তা আমি জানি, কারণ আমিও একই জিনিস ভাবছি।'

'কী ভাবছ ?'

'আমি ভাবছি নিকির কথা। নিকি কী করবে ? কার কাছে যাবে ? তোমার কাছে না আমার কাছে ?'

আমার গা ঝিমঝিম করতে লাগল। আসলেই আমি তাই ভাবছি। আমরা দু'জন পাশাপাশি দাঁড়ানোমাত্র নিকি সব গুলিয়ে ফেলবে। কার কাছে সে যাবে ? আমার কাছে না তার কাছে ? তার কাছে যাওয়া মানেই তো আমার কাছে যাওয়া। কিন্তু সত্যি কি তাই ? নিকি আমার সামনে ঐ লোকটিকে চুমু খাবে, এই দৃশ্য

আমার পক্ষে সহ্য করা কি সম্ভব ? না, সম্ভব নয়। আমি দ্বিতীয়বার বললাম, 'ওরা এমন করল কেন ?'

'তুমি যা জান না, আমিও তা জানি না। তবে আমার মনে হয় নিকি আমাদের দু'-জনকে পেয়ে কী করে এবং আমরা কী করি, তাই তারা দেখতে চাচ্ছে। তোমারও নিশ্চয়ই সে-রকমই মনে হচ্ছে, তাই না ?'

'হ্যাঁ, তা-ই।'

'মানব-মানবীর সম্পর্কের ব্যাপারটায় তারা কৌতূহলী হয়েছে। এই জিনিসটা তারা পরীক্ষা করে দেখতে চায়। তোমারও নিশ্চয়ই সে রকমই মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, হচ্ছে।'

'আমার তো মনে হয়, ওদের সঙ্গে এখন আমাদের কথা বলা দরকার। ওরা কী চায় জানা দরকার। এই ভয়াবহ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে ওদের সাহায্য ছাড়া উপায় নেই।'

'যোগাযোগটা করব কীভাবে ? আমরা চেষ্টা করলে তো হবে না, এরা যখন যোগাযোগ করতে চাইবে তখনই হবে।'

'তা ঠিক। আপাতত অপেক্ষা করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ দেখছি না। অপেক্ষা করা যাক।'

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। ক্লান্তিকর দীর্ঘ প্রতীক্ষা। কোনো লাভ হল না। কেউ যোগাযোগ করল না। আমরা তিনজন অপেক্ষা করছি। তিনজন বলা কি ঠিক হচ্ছে ? না, ঠিক হচ্ছে না। আমরা আসলে দু' জন। আমি এবং নিকি। আমি ব্যাপারটা একটু গোলমেলে হয়ে গেছে। এখানে দু' জন আমি উপস্থিত।

নিকি যে কী প্রচণ্ড সমস্যায় পড়েছে তা বুঝতে পারছি। কারো দিকেই সে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। আমি তার দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে ভাবে হাসলাম, সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। আমি লক্ষ করলাম অন্য আমিও তার দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে ভাবে হাসছে। নিকি তার কাছ থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। তার ভাব দেখে মনে হল সে এখন কাঁদবে। যদি সত্যি সত্যি কাঁদে, আমি তাকে সান্ত্বনার দু'-একটা কথা নিশ্চয়ই বলব। তখন অন্য আমিটি কী করবে ? সেও কি সান্ত্বনার কথা বলবে ? বলাই তো উচিত। আমরা দু' জন তো আলাদা নই।

আমি খাটের ওপর বসেছিলাম, উঠে দাঁড়ালাম। ক্লান্ত গলায় বললাম, 'রান্নাঘরে যাচ্ছি। তোমরা দু' জন কথাবার্তা বল। এতে ব্যাপারটা সহজ হবে।'

নিকি ভারি গলায় বলল, 'সহজ হবার কোনো দরকার নেই। তোমারও অন্য ঘরে যাবার প্রয়োজন নেই।'

নিকি কাঁদতে শুরু করল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। আমি আগে কখনো নিকিকে কাঁদতে দেখি নি। সে শক্ত ধরনের মেয়ে, সহজে ভেঙে পড়ার মতো নয়। কিন্তু সে ভেঙে পড়েছে। আমি রান্নাঘরে চলে এলাম। নিকির কান্নার ছবি সহ্য করতে পারছি না।

সময় কি মাঝে-মাঝে থেমে যায় ? মহাবীর থর নাকি কয়েক মুহূর্তের জন্য সময় থামিয়ে দিয়েছিলেন। ওরা কি তাই করেছে ? সময় কি থেমে আছে ? রান্নাঘরে আমি একা-একা দাঁড়িয়ে আছি। মনে হচ্ছে অযুত নিযুত লক্ষ কোটি বছর পার হয়ে যাচ্ছে, আমি দাঁড়িয়েই আছি। মাঝে মাঝে নিকির কান্নার শব্দ পাচ্ছি। সে কিছুক্ষণ পর পর ফুঁপিয়ে উঠছে।

আমার মধ্যে অদ্ভুত একটা চিন্তা এই সময় এল। মনে হল, যারা একই রকম দু' জন মানুষ তৈরি করতে পারে, তারা তো একই রকম দু' লক্ষ মানুষ তৈরি করতে পারবে, কিংবা তার চেয়েও বেশি—দু' কোটি। একটি গ্রহ এক ধরনের মানুষ দিয়ে ভর্তি করে ফেলতে পারবে। অবস্থাটা তখন কী হবে ? গ্রহের সবাই এক ধরনের চিন্তা করছে এবং একই ভাবে করছে, একই জিনিস নিয়ে ভাবছে। তাদের সবার ভেতর চমৎকার হৃদয়ের বন্ধন থাকবে, কারণ তারা আলাদা কেউ নয়। একই সঙ্গে একা এবং অনেকে।

আমি একটা চমক বোধ করলাম। একই সঙ্গে একা এবং অনেকে কথাটা আমি আগে শুনেছি। 'ওরা' আমাকে বলেছে। যে-সব মহাজ্ঞানীরা আমাদের নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছে তারাই নিজেদের সম্পর্কে বলেছে 'আমরা একই সঙ্গে একা এবং অনেকে।' তাহলে তারা কি—?

আমার মাথায় ভোঁতা যন্ত্রণা হতে লাগল। ওদের সঙ্গে যোগাযোগের এটা হচ্ছে পূর্বাবস্থা। যোগাযোগ হল।

'তুমি ঠিক লাইনেই চিন্তা ভাবনা করছ।'

'আমি ঠিক লাইনে চিন্তা-ভাবনা করছি কি না তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আপনি আমাকে বলুন, আপনাদের নতুন খেলার অর্থ কী ?'

'কোন্‌টাকে তোমরা নতুন খেলা বলছ ?'

'আমাকে দ্বিতীয় বার তৈরি করেছেন, যার কোনো প্রয়োজন ছিল না।'

'অপ্রয়োজনীয় কিছু করার মতো সময় আমাদের নেই। যা করা হয়েছে, প্রয়োজনেই করা হয়েছে। মানব সম্প্রদায়ের প্রধান ত্রুটি কী, তা ধরতে চেষ্টা করছি। তুমি চাইলে তোমাকে ব্যাখ্যা করতে পারি।'

'আমি চাই না।'

'না চাইলেও শোন, তোমাদের প্রধান ত্রুটি হচ্ছে পুরুষ এবং রমণীর ব্যাপারটি। মানুষকে অসম্পূর্ণ ভাবে তৈরি করা হয়েছে। একজন পুরুষ মানুষ হিসেবে যেমন সম্পূর্ণ নয়, তেমনি একজন রমণীও নয়। দু' জনকে একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ মানুষ তৈরি করা যেতে পারে। বংশবৃদ্ধির পদ্ধতিটি তাতে বদলাবে, নতুন ধরনের মানুষ তৈরি হবে। তাকে তুমি মুক্ত-মানুষ বলতে পার।'

'মুক্ত-মানুষ ?'

'হ্যাঁ মুক্ত-মানুষ। সম্পূর্ণ মুক্তির জন্যে অবশ্যি তোমাদের শারীরিক প্রক্রিয়াও বদলে দিতে হবে। বিশেষ করে খাদ্যগ্রহণের প্রক্রিয়া। খাদ্য থেকে তোমরা শক্তি সংগ্রহ কর, অতি নিম্নস্তরের প্রাণী যা করে। তোমাদের সমস্ত চিন্তা-চেতনা খাদ্য-সংগ্রহকে ঘিরে।

মেধার কী অপচয় ! শক্তিসংগ্রহের প্রক্রিয়াটাকে সহজেই বদলে দেয়া যায়। এমন করে দেয়া যায়, যাতে প্রয়োজনীয় শক্তি তোমরা সূর্য থেকে সংগ্রহ করতে পার।'

'গাছের মতো ?'

'অনেকটা তাই।'

'মানুষ হয়ে জন্মেছি, গাছ হবার ইচ্ছা নেই।'

'সব কিছুই তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করছে, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।'

'সব কিছু আপনাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাতেই হবে, এ রকম মনে করারও কোনো কারণ নেই।'

'মানুষের দ্বিতীয় ত্রুটিটি হচ্ছে আবেগনির্ভর যুক্তিপ্রয়োগ। যুক্তি এবং আবেগ দু'টি ভিন্ন জিনিস। তোমরা দু'টিকে মিশিয়ে অদ্ভুত একটা কিছু তৈরি কর, যা যুক্তিও নয়, আবেগও নয়।'

'আপনারাও তো তাই করেছেন, পুরুষ এবং রমণী দু'টি ভিন্ন জিনিস। দু'টিকে মিশিয়ে অদ্ভুত কিছু তৈরি করতে চেষ্টা করেছেন—যা পুরুষও হবে না, রমণীও হবে না।'

'তুমি আবার একটি আবেগনির্ভর যুক্তি প্রয়োগ করলে। তোমাদের তৃতীয় ত্রুটি হচ্ছে...'

'ত্রুটির কথা শুনতে-শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সম্পর্কে ভালো কিছু বলার থাকলে বলুন ?'

'সত্যি শুনতে চাও ?'

'হ্যাঁ চাই।'

'বিস্ময়কর ক্ষমতা দিয়ে তোমাদের পাঠানো হয়েছে কিংবা বলা যেতে পারে বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন এক শ্রেণীর প্রাণের উদ্ভব হয়েছে, যারা তাদের সত্যিকার ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। দু'টি জগৎ আছে—একটি বস্তুজগৎ, অন্যটা পরা-বস্তুজগৎ। মানুষের ক্ষমতা পরা-বস্তুজগতে। অথচ তা সে জানে না। সে মেতেছে বস্তুজগৎ নিয়ে। বাধ্য হয়ে মানুষদের তা করতে হচ্ছে, কারণ শারীরিক প্রক্রিয়ার কারণে মানুষ বস্তুজগতের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। যে জন্যে পরা-বস্তুজগতের বিপুল সম্ভাবনার কিছুই মানুষ জানে না।'

'পরা-বস্তুজগৎ ব্যাপারটা কী ?'

'বস্তুজগতের বাইরের জগৎ।'

'শক্তিজগৎ ?'

'না। বস্তু এবং শক্তি আলাদা কিছু নয়। পরা-বস্তুজগৎ হচ্ছে মাত্রাশূন্য জগৎ।'

'কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারার কথা নয়। তোমরা বাস করছ তিন মাত্রার জগতে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা—এই মাত্রা যেই জগতে বিলুপ্ত তাকে পরা-বস্তুজগৎ বলতে পার।'

'বুঝতে পারছি না। আরো সহজ করে বলুন।'

'এর চেয়ে সহজ করে বলতে পারছি না। বরং তোমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে একটি উদাহরণ দিই। তোমরা একটি অভিযাত্রী দল নিয়ে রওনা হয়েছ। তোমাদের যাত্রা অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে। যার জন্যে তোমরা একটা মহাকাশযান তৈরি করেছ। অথচ যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তোমরা ঘরে বসেই যা জানার জানতে পারতে, কারণ তোমরা মাত্রা ভাঙতে পার। এই জিনিসটা তোমাদের অজানা।'

'আমাদের শিখিয়ে দিন।'

'শেখানো সম্ভব নয়। আমাদের সেই ক্ষমতা নেই। আমরা চতুর্মাত্রিক জীব। ত্রিমাত্রিক জগতের অর্থে আমাদের ক্ষমতা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু পরা-জগতে আমাদের কোনো আধিপত্য নেই। যে কারণে তোমাদের দেখে আমরা একই সঙ্গে বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছি। অকল্পনীয় ক্ষমতা তোমাদের হাতের মুঠোয়, অথচ তোমরা কত অসহায়। সামান্য একটি ব্ল্যাকহোলের খপ্পরে তোমাদের মহাকাশযান পড়ল, তোমরা সেই ব্ল্যাকহোলের কবল থেকে বেরুতে পারছ না। অথচ ইচ্ছা করলেই নিমিষের মধ্যে তোমরা নতুন একটি পৃথিবী তৈরি করতে পার, একটি নক্ষত্রপুঞ্জ তৈরি বা ধ্বংস করতে পার।'

'আপনি এসব কী বলছেন !'

'যা সত্যি তাই বলছি। আমরা পরিব্রাজক, আমাদের এক মুহূর্তের জন্যেও থেমে থাকার কথা নয়। আমরা থেমে আছি তোমাদের জন্যেই। তোমাদের বিস্ময়কর ক্ষমতা আমাদের অভিভূত করেছে। এই সঙ্গে বিষাদগ্রস্তও হচ্ছি। মেধার কী বিপুল অপচয় !'

'কেন জানি আপনার কথা ঠিক বিশ্বাস্য মনে হচ্ছে না।'

'মনে না হবার কোনো কারণ নেই। তোমাদের সঙ্গে এক জীববিজ্ঞানী আছে, যার নাম ইনো। সে নিজেই তার পছন্দমতো একটি জগৎ তৈরি করেছে। অথচ তার ধারণা আমরা তা তৈরি করেছি। আমরা করি নি। আমরা শুধু পরাবস্তু-ক্ষমতার প্রয়োগের জন্যে পরিবেশ তৈরি করেছি। মেয়েটিকে সীমাহীন নিঃসঙ্গতায় ঠেলে দিয়েছি। যে কারণে সে নিঃসঙ্গতা থেকে বাঁচার জন্যে নিজেই নিজের একটি জগৎ তৈরি করেছে। তোমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলাম। তুমি দেখেছ।'

'সেই জগৎ কি মায়া না সত্যি ?'

'সত্যি তো বটেই। এখন কি তুমি বুঝতে পারছ কী পরিমাণ ক্ষমতা তোমাদের আছে ?'

'বুঝতে চেষ্টা করছি।'

'তুমি বারবার তোমার পৃথিবীতে ফিরে যাবার কথা বলছ। আমাদের বলার তো কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি তো নিজে ইচ্ছে করলেই ফিরে যেতে পার। কিংবা অবিকল সেই পৃথিবীর মতো পৃথিবী তৈরি করতে পার তোমার চারপাশে।'

'আমার অন্য সঙ্গীরা কী করছে ? তারা কি এসব জানে ?'

'না, তারা জানে না। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয় নি। তারা তাদের মিশন সম্পূর্ণ করতে চায়। আমরা তাদের তা করতে দেব। মহাকাশযানটি তৈরি করা প্রায় শেষ। শিগগিরই হয়তো ওরা যাত্রা শুরু করবে।'

'আমাকে নিয়ে আপনাদের কী পরিকল্পনা ?'

'পরিকল্পনার কথা তোমাকে আগেই বলেছি। মানবজাতির ক্রুটিগুলি আমরা দূর করতে চাই। তুমি এবং তোমার বান্ধবী সম্পূর্ণ নতুন একটি ক্রুটিমুক্ত মানব-সমাজ তৈরি করতে পার, যা হবে অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী। যারা তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকবে। বস্তুর ওপর প্রয়োগ করবে তার সীমাহীন ক্ষমতা।'

'তা কি ভালো হবে ?'

'কেন হবে না ?'

'আপনারা যে-সমস্ত জিনিসকে ক্রুটি বলছেন, হয়তো সেগুলি ক্রুটি নয়। পরা-বস্তু-ক্ষমতার প্রয়োগের সময় এখনো আসে নি বলেই হয়তো তা সুপ্ত অবস্থায় আছে। একদিন বিকশিত হবে।'

'কিংবা কোনো দিনও হবে না। আমরা তা হওয়াতে চাই বলেই প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে চাই।'

'আপনারা দয়া করে আমাদের আমাদের মতো থাকতে দিন। আমাকে আমার জায়গায় ফিরে যেতে দিন।'

'কী হবে ওখানে গিয়ে, এ জীবনে যা চেয়েছ সবই তো পাচ্ছ। জীবন শুরু করবে চমৎকার একটি গ্রহে। পাশে থাকবে তোমার বান্ধবী।'

'দয়া করে আপনারা আমাকে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।'

'তোমাকে ফেরত পাঠানো কঠিন কিছুই নয়। কিন্তু তার ফলাফল তোমার জন্যে ভয়াবহ হবে।'

'কেন ?'

'ঠাণ্ডামাথায় বুঝতে চেষ্টা কর। যে-পৃথিবী ছেড়ে তুমি মহাকাশযানে করে চলে এসেছ সেই পৃথিবীতেই তুমি হঠাৎ করে উপস্থিত হবে। তোমাকে পাঠাতে হবে চতুর্মাত্রার মাধ্যমে, তাতে সময় সংকোচন হবে। সেই সময় সংকোচনের ফলে তুমি উপস্থিত হবে এমন এক সময়ে যখন তুমি পৃথিবী ছেড়ে রওনা হও নি।'

'আমি বুঝতে পারছি না।'

'সময় সংকোচনের ব্যাপারটা তো জান ?'

'না, জানি না। সময়-সম্প্রসারণের ব্যাপারটা জানি। আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটিতে আছে। মহাশূন্যে সময় শ্লথ হয়ে যায়। সেই তুলনায় পৃথিবীর বয়স দ্রুত বাড়ে। একজন মহাকাশচারী তিনমাস নক্ষত্রপুঞ্জে কাটিয়ে ফিরে এলে দেখতে পায় পৃথিবীতে তিন বছর পরে হয়ে গেছে।'

'সময় সংকোচন হচ্ছে ঠিক তার উল্টো। তোমাকে এখন পাঠানো হলে তুমি অতীতে চলে যাবে।'

'কী রকম অতীতে ?'

'খুব বেশি নয়। তুমি পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করেছিলে ৩০ জুন। তোমাকে পৃথিবীতে পাঠালে তুমি উপস্থিত হবে এপ্রিল মাসে। যাত্রা শুরুর দু'মাস আগে। এর একটা ভয়াবহ দিক আছে। তা নিয়ে কি ভেবেছ ? ভয়াবহ দিকটি বুঝতে পারছ ?'

'পারছি। যেহেতু আমি পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু হবার আগেই পৃথিবীতে পৌছাচ্ছি, সেই হেতু পৃথিবীতে পৌছে আমি আমাকেই দেখতে পাব। আবার আমরা হব দু' জন।'

'না। তা হবে না। প্রকৃতি অনিয়ম সহ্য করে না। কাজেই তুমি তোমাকে পাবে না। প্রকৃতি তা হতে দেবে না। তোমার অতীতে ফিরে যাবার ব্যাপারটা প্রকৃতির নিয়মে গ্রহণযোগ্য হবার জন্যে যে পৃথিবী থেকে তুমি এসেছিলে অবিকল সেই পৃথিবীতে তুমি ফিরে যাবে না। পৃথিবী হবে একটু অন্যরকম। মাত্রা যাবে বদলে।'

'তার মানে ?'

'আমরা বলতে পারছি না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসীম রহস্যের অতি অল্পই আমরা জানি। সেই অল্প জ্ঞান নিয়ে সব ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, মাত্রা ভাঙার ফল সাধারণত ভয়াবহ হয়ে থাকে। তুমি একটি ভয়াবহ চক্রে পড়ে যেতে পার। তারপরেও যদি যেতে চাও তাহলে ভিন্ন কথা।'

'যেতে চাই।'

'ভালো করে ভেবে বল।'

'ভেবেই বলছি।'

'বেশ, ব্যবস্থা হবে। মাত্রা ভেঙে তোমাকে ফেরত পাঠানো হবে।'

'ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই বিশেষ ক্ষণটি কখন ?'

'অস্থির হয়ো না। হবে, শিগগিরই হবে। পৃথিবীতে ফিরে যাবার আগে তুমি কি একবার দেখতে চাও না, আমরা এখানে তোমার এবং তোমার বান্ধবীর জন্যে কী ব্যবস্থা করে রেখেছি। হয়তো এটা দেখলে তুমি মত বদলাবে।'

'আমি কিছুই দেখতে চাই না।'

'জন বরগ তার মিশন নিয়ে যাত্রা শুরু করবে। তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে কত না বিস্ময় ! ঐ দলের সঙ্গেও তুমি যোগ দিতে চাও না ?'

'না।'

'বিদায় সম্ভাষণও জানাবে না ?'

'না।'

'বেশ, তুমি যা চাও তাই হবে। আর কিছু কি তোমার বলার আছে ?'

'আপনি যে আমার মতো আরেকজন তৈরি করেছেন তার কী হবে ? সেও যদি আমার মতো পৃথিবীতে উপস্থিত হয়, তাহলে তো ভয়াবহ ব্যাপার হবে। আমরা হব তিনজন।'

'সে এখানেই থাকবে। যে গ্রহটি তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করা ছিল, সেই গ্রহে সে চলে যাবে। তোমার বান্ধবী নিকি যাবে তার সঙ্গে। নতুন বসতি শুরু হবে। নতুন মানব সম্প্রদায়ের শুরু করবে তারা।'

'অসম্ভব। নিকি কেন যাবে?'

'যাবে, কারণ তুমি পৃথিবীতে তোমার নিকিকে পাবে। একে তোমার প্রয়োজন নেই। তুমি একজন নিকিকে সঙ্গে করে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে উপস্থিত হতে চাও না।'

আমি চুপ করে রইলাম। আমার অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। কী ভয়ংকর পরিস্থিতি! এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার কি কোনো পথ নেই? ওরা আবার কথা বলল, 'ওদের নতুন জীবন শুরুর দৃশ্যটি আমরা তোমাকে দেখাতে চাই।'

'আমি দেখতে চাই না।'

'না চাইলেও দেখতে হবে।'

'আমি দেখতে চাই না, কারণ নিকি অন্যের হাত ধরে হাঁটছে, এই দৃশ্য সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'অন্যের হাত ধরে তো হাঁটবে না। তোমার হাত ধরেই হাঁটবে। আমরা এই দৃশ্যটি দেখাতে চাই, যাতে তোমার মত বদলায়, তুমি পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল কর। পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া তোমার জন্যে ভয়াবহ ব্যাপার হবে।'

'হলে হবে।'

যোগাযোগ কেটে গেল। আমি চোখ মেলে তাকালাম। আমার পাশে নিকি নেই। অন্য আমিও নেই। ওরা নিশ্চয়ই নতুন জীবন শুরু করেছে। করুক। আমি ফিরে যাব আমার চেনা পৃথিবীতে। ওদের জীবন শুরুর দৃশ্য দেখার আমার কোনো ইচ্ছা নেই।

তবু দেখতে হল।

১০

স্বপ্নদৃশ্যের মতো একটি দৃশ্য। খণ্ড খণ্ড ছবি। কী অপূর্ব! অভিভূত করে দেবার মতো সুন্দর। মন খারাপ করিয়ে দেবার মতো সুন্দর।

বৃক্ষ লতাগুল্মময় অরণ্য। নাম-না-জানা অসংখ্য ফুল ফুটে আছে। বিচিত্র রূপ। হালকা বাতাসে গাছের পাতা কাঁপছে। মর্মরধ্বনির মতো ধ্বনি। আমি গাঢ় আনন্দময় হাসির শব্দ শুনলাম। হাসতে হাসতে নিকি ছুটে যাচ্ছে, তার পেছনে পেছনে যাচ্ছে—যে তাকে ধরবার জন্যে ছুটছে, তাকেও আমি চিনি। সে অন্য আমি।

ছবি মিলিয়ে গেল। এখন অন্য ছবি। জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটেছে। আকাশে দু'টি চাঁদ। একটি প্রকাণ্ড, অন্যটি ছোট। নীলাভ আলোর বন্যায় অরণ্য ভেসে যাচ্ছে। দু'টি চাঁদের কারণেই হয়তো গাছের পাতায় রামধনুর মতো রঙ। আমি ওদের দু'জনকে দেখেছি, তারা মুগ্ধ বিস্ময়ে জোৎস্না দেখছে। কী গভীর আনন্দ ওদের চোখে-মুখে!

এই ছবিও মিলিয়ে গেল, এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি। বিশাল সমুদ্র। সমুদ্রের জলের রঙ গাঢ় সবুজ, কারণ আকাশের রঙ সবুজ। সমুদ্র খুব শান্ত নয়। বড়ো বড়ো ঢেউ উঠছে। ওরা দু' জন ভয় এবং বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে।

আমার স্বপ্ন কেটে গেল। আমি শুনতে পেলাম, 'তুমি কি থেকে যেতে চাও না ?'

আমি বললাম, 'না।'

১১

ঘুম ভাঙল।

অভ্যাসবশে তাকালাম ঘড়ির দিকে—ন'টা দশ বাজে। জানালার ভাঙা কাঁচ দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে পায়ের কাছে। দেয়ালে ক্যালেন্ডারে এপ্রিল মাস, তার মানে ফিরে এসেছি পৃথিবীতে। আমার চেনা জায়গা, চেনা জগৎ।

উঠে গিয়ে জানালা খুললাম। অস্পষ্টভাবে মনে হল বাইরের এই পৃথিবী একটু যেন অন্য রকম। সূক্ষ্ম কিছু পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন এত সূক্ষ্ম যে ঠিক ধরা যাচ্ছে না। অথচ রাস্তাঘাট আগের মতোই আছে। দোকানপাট একই রকম। তবুও কেন জানি আলাদা।

প্রকৃতি তার জগতে অনিয়ম সহ্য করে না, কথাটা বোধ হয় ঠিক। দ্বিতীয় আমির দেখা পেলাম না। নিজের ঘরেই রাত এগারটা পর্যন্ত বসে রইলাম। কেউ এল না। দ্বিতীয় আমি বলে কেউ থাকলে এর মধ্যে এসে পড়তো। প্রকৃতি এই ভয়াবহ অনিয়ম হতে দেয় নি। নিজেকে কোনো এক ভাবে বদলে ফেলছে।

রাত বারটার দিকে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে নিকিকে টেলিফোন করলাম। আমি জানি মাঝরাতে টেলিফোন পেয়ে সে প্রথমে খানিকটা কপট বিরক্তি দেখালেও শেষটায় প্রচণ্ড খুশি হবে। সব সময় তাই হয়।

অনেকক্ষণ রিং হবার পর নিকির ঘুমন্ত গলা শোনা গেল, 'কে ?'

'আমি।'

'আমিটা কে ?'

'আমাকে চিনতে পারছ না নিকি ?'

'না।'

আমি আমার নাম বললাম। নিকি কঠিন স্বরে বলল, 'এখন চিনতে পারছি। কেন আপনি রাতদুপুরে বিরক্ত করেন ?'

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। নিকি এসব কী বলছে !

'হ্যালো নিকি ?'

'আর একটি কথাও নয়। আর একটি কথা বললে আমি পুলিশে খবর দেব। শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা ? আপনার যন্ত্রণা অনেক সহ্য করেছি।'

আমি শুনলাম ঘুম জড়ানো এক পুরুষ-কণ্ঠ বলছে, 'কে কথা বলছে নিকি ?' নিকি বলল, 'ঐ বদমাশটা। আবার রাতদুপুরে ফোন।'

নিকি টেলিফোন নামিয়ে রাখল। আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। প্রকৃতি তার জগতে অনিয়ম সহ্য করে না। প্রয়োজনে পুরো জগৎটা বদলে দেয়। তাই সে করেছে।

সারা রাত আমার ঘুম হল না। ভোর বেলায় ত্রিভুজ চিহ্ন দেয়া চিঠি পেলাম।

জনাব,

আপনাকে অবিলম্বে মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের সপ্তম শাখায় উপস্থিত হতে বলা হচ্ছে। অত্যন্ত জরুরি।

বিনীত

এস. মাথুর

ডিরেক্টর, মহাশূন্য গবেষণা কেন্দ্র-৭

আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। ভয়াবহ চক্রের ব্যাপারটি এখন বুঝতে পারছি। জুন মাসের ৩০ তারিখে আমি রওনা হব মহাকাশযানে। আবার ফিরে আসব এই পৃথিবীতে। এসে দেখব এপ্রিল মাস। দু'মাস কাটবে, আবার আসবে জুন মাস—মহাকাশযানে করে রওনা হব, আবার ফিরে আসব। অযুত নিযুত লক্ষ কোটি বছর ধরে এই চক্র চলতেই থাকবে। প্রকৃতি তার জগতের নিয়ম ভঙ্গকারীকে এমনি করেই শাস্তি দেবে।

চিঠি হাতে আমি রাস্তায় নেমে এলাম। বারবার ইচ্ছা হচ্ছে লাফিয়ে কোনো একটা দ্রুতগামী বাসের সামনে পড়ে যাই। চক্র ভাঙার এই একটি মাত্রই পথ। তা অবশ্য করলাম না। হেঁটে হেঁটে উপস্থিত হলাম নিকির ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। সে এপ্রন গায়ে দিয়ে টিনের কৌটা সাজাচ্ছিল। আমাকে দেখতেই চিনতে পারল। কঠিন মুখে বলল, 'আবার জ্বালাতে এসেছেন ? আপনার কাণ্ড কিছু বুঝি না, প্রতি বছর এপ্রিল মাসে রাত বারটায় একবার টেলিফোন করবেন, তার পরদিন আসবেন দেখা করতে। বাকি বছরে আর আপনার কোনো খোঁজ নেই ? কে আপনি বলুন তো ?'

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, 'আমি কেউ না। তোমার সঙ্গে আগামী বছর আবার দেখা হবে।'

ফিরে যেতে যেতে মনে হল—ভয়াবহ চক্রে শুধু যে আমি একা আটকা পড়েছি তাই নয়, এই পৃথিবীর সবাই আটকা পড়েছে। অনন্তকাল ধরে নিকিকে এপ্রিল মাসের এক রাতে টেলিফোন পেয়ে জেগে উঠতে হবে। অনন্তকাল ধরে এই পৃথিবী থেকে একটি মহাকাশযান জুন মাসের ৩০ তারিখ যাত্রা শুরু করবে অনন্ত নক্ষত্রবীথির দিকে। কোনো দিন যা কোথাও পৌছবে না।